সপ্তপর্ণী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

বিশ্ববাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৭

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্বাবাণী
১১।এ, বারাণসী ঘোষ , কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৭।১ বিন্দু পালিত লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গনেশ বসু

তিন টাকা

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী

—শ্রদ্ধাস্পদেষু

Saptaparnee

By

Mahasweta Bhattacharya

3·00

তৃষ্ণা

নাম না বললেও চলে, এমনি একটা মফঃস্বল শহর। কলকাতা থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেণে মাত্র আট ঘণ্টার রাস্তা।

এখানে আপনি ইচ্ছে করলে-ই আসতে পারেন। ট্রেণ আছে চারটে। সময় যদি হাতে থাকে, আর তেমন কোন কাজের তাড়া না থাকে তবে আমি বলব আপনি দুপুর দুটোর গাড়ীটা ধরুন।

স্নান করে ভাত খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে বসতে পারবেন ট্রেণে। ট্রেণটা চলতে স্নুরু করলে আপনার মনে হবে, এতক্ষণে একটু বিশ্রামের অবকাশ মিললো।

সে কথা সত্যি না-ও হতে পারে। ট্রেণ-ও ছাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে আপনার সঙ্গী হলো ক্যান্‌ভাসার-রা। একপাতা সেফটিপিন্, মুর্টন কোম্পানীর লজেন্স, সস্তা বাংলা উপন্যাস, তালাচাবি, সোডালেমনেড এবং মিঠে পান কিনবার জন্য আধ মিনিট বাদে বাদে তারা আপনাকে উত্যক্ত করবে।

আপনি অধৈর্য হবেন। অপারগ হয়ে দুটো একটা জিনিষ কিনবেন। তারপর-ও সেই ক্যানভাসার এবং আরো নতুন নতুন ক্যানভাসার এসে আপনাকে উত্যক্ত করবে। আপনি তখন গা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করবেন।

ঘুমের ঢুলুনীর ফাঁকে ফাঁকে এক একবার ট্রেণ থামবে। আপনি চোখ চেয়ে দেখবেন অখ্যাত এক একটা স্টেশনের নাম।

অখ্যাত, তবু তাদের-ও পরিচয় আছে, নিজস্বতা আছে। মুড়াগাছা-র বিখ্যাত চা খেতে আপনাকে একবার প্ল্যাটফর্মে নামতে-ই হবে। বেলডাঙার মনোহরা এক হাঁড়ি আপনি-ও কিনে নেবেন। দেবগ্রামের বিখ্যাত বটগাছ-টি ঝুঁকে পড়ে আপনার-ও দেখে নিতে

সাধ যাবে। আর সারগাছির রামকৃষ্ণ মিশনের আলো পেছনে রেখে ট্রেণ যখন স্পীড বাড়িয়ে অন্ধকারে সাঁতার দেবে, তখন আপনি-ও বাক্স-বিছানা গোটাবেন।

তখন বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ঘড়িতে সাতটা বাজে। ট্রেণটা হুইস্‌ল্‌ বাজাবে, তখনই আপনি দেখতে পাবেন দূরে ফোঁটা ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে।

শহরটা কাছে এসেছে।

এই শহরে একদিন এমনি করে-ই এসেছিল পার্সিসাহেব। এসেছিল অনেক বন্দরের জল খেয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন পা-খানা তার জখম হলো, তখন বুরহানপুরের হাঁসপাতালের লাশ ঘরে একখানা পা রেখে ক্রাচ বগলে করে এসে দাঁড়িয়েছিলো পার্সিসাহেব। সেখান থেকে হোমের ফাদার-রা তাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি নিয়ে পার্সিসাহেব এই শহরে এসেছিলো। দূর থেকে শহরটার আলো দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছিলো, ঐখানটায় বোধহয় তার একটা ঘর মিলবে। ঐখানে তার আশ্রয় আছে।

চোখে দেখবার আগেই জায়গাটাকে সে ভালোবেসেছিলো।

গোকুল মান্না আর আকাশী এসেছিলো কেষ্টনগর থেকে। জেল ফেরৎ দাগী চোর গোকুলকে বীরনগর মিউনিসিপ্যাল অফিসে আর কাজ দিলেন না বাবু-রা।

আকাশী পালবাবুর হোটেলে ভাত-রাঁধতো। গোকুল ভাত খেয়ে পয়সা না দিয়ে পালিয়েছিলো। তাই পালবাবুদের দরোয়ান তাকে বের করে দেয়।

দুটো ভাতের জন্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে অপমান হতে দেখে আকাশীর মনে লেগেছিল।

সে আঁচল চাপা দিয়ে থালা নিয়ে নিজের ঘরে ডেকে খাইয়েছিলো গোকুলকে।

একদিন বলেছিলো

—কাজ করলে-ই পার।

—চোরকে কে কাজ দেবে?

—চুরি কর কেন?

—পেটের জ্বালায়।

—তোমাকে সকলে চোর বলে আমার ভাল লাগে না।

গোকুল অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাকে এমন কথা কেউ বলেনি। সে বলেছিল।

—আচ্ছা, আর চুরি করব না। দেখি কাজ পাই কি না।

কিন্তু স্বভাবের কামড় গোকুল ছাড়তে পারেনি। ঐ পালবাবুদের-ই জ্ঞাতিদের গুদামের চাল চুরি করে ধরা পড়েছিল।

কোমরে দড়ি বেঁধে গোকুলকে যেদিন ওরা থানায় নিয়ে গেল, সেদিন আকাশীর খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে মনে নিজেকে দোষী করে আকাশী বলেছিল,

—যে মানুষটা জন্মদাগী, তার তরে পোড়ামন বারে বারে পোড়ায় কেন? এ আবার কোন্ নতুন জ্বালা?

আবার গোকুল যেদিন ফিরে এলো, এসে আকাশীর-ই ঘরে উঠলো—আকাশী বললো

—এবারে আমাকে কলঙ্ক দিয়ে বের করে দেবে বাবু-রা।

গোকুল বলেছিলো

—চ' আকাশী, পালিয়ে যাই।

—কোথায় যাব?

—যেখানে হয়। আমি তুই দু'জনে ক্রেস্তান হবো। পাদ্রী-সায়েবরা ঠিক কাজ দেবে 'খন। ওরা ফেলবে না। দু'জনে বিয়ে করবো।

—আমি ক্রেস্তান হবো ?

—নয়তো তুই বিধবা, তোর বিয়ে কেমন করে হবে? তোর রুইদাস জাতে যে চল নেই।

—বিয়ে করবে তো ?

—নিশ্চয়। কবুল খাচ্ছি।

—আর চুরি ছেড়ে দেবে ?

—আবার কবুল খাচ্ছি।

তখন আকাশী দু'জনের জন্যে ভাত বেড়ে জল গড়িয়ে নিয়েছিল। বলেছিল,

—কাল বিকেলের গাড়ী ধরবো। আজ যা হয় বলে বাবুদের কাছ থেকে মাইনের টাকা ক-টা চেয়ে নিই।

পরদিন-ই বিকেলের গাড়ীটা ধরেছিলো তারা। ভোরবেলা বীরনগর থেকে কেষ্টনগরে এসে বিয়েটা সেরে নিয়েছিল। তারপর কেষ্টনগর থেকে গাড়ীতে উঠেছিল।

ট্রেণটা যখন এই শহরটার কাছে এসেছিল—তারা-ও ভেবেছিল, এইবার এইখানে তাদের আশ্রয় মিলবে।

অন্ধকারের গায়ে আলোর ফোঁটাগুলোকে মনে হয়েছিলো বন্ধুজনের হাতছানি।

সেদিন বড় ভালো লেগেছিলো আকাশী আর গোকুলের।

শহরের নতুন গোরস্থান। স্টেশন থেকে রাস্তাটা ময়দানের পাশ দিয়ে সোজা শহর মুখে এগিয়ে যাবার সময় বাঁ-হাতি লোহার গেটটার সামনে একটু ঘুরে গিয়েছে।

এখান থেকে ময়দান পেরিয়ে উত্তরে পুরনো গোরস্থানটা চমৎকার দেখা যায়। পলাশী যুদ্ধের-ও আশী বছর আগেকার কবরখানা। বড় বড় সমাধি ফলকের চুড়ো, ঠেলে উঠেছে আকাশের দিকে। জ্বর, ম্যালেরিয়া অথবা কলেরায় মরা ভ্যালেন্টাইন, প্যাট্রিসিয়া,

অগষ্টাসদের হাড়গুলো কবে যেন বাংলা দেশের মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

ল্যাটিন প্রার্থনার হরফগুলোর ফাটলে এখন পরম নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধে বিচরণ করে সরীসৃপ।

রাতে নাকি গোরস্থানে আজও ভূত দেখা যায়। সাহেব-মেমরা ভূতুড়ে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে এসে দাঁড়ায় এখানে। পুরনো দারোগা-সাহেব সাহসী মানুষ। কাশিমবাজার থেকে ডাকাতির মামলা মিটিয়ে মাঝ রাতে ফিরতে স্বচক্ষে দেখলেন। পরদিন সকলের কাছে গল্প করলেন।

নতুন গোরস্থানটা বুঝি বা পুরনো গোরস্থানটাকে দেখে হাসে। কবে পলাশীর পালা শেষ হয়ে গিয়েছে। কাশিমবাজার লালবাগের কুঠিগুলোতে আজ বসেছে সরকারী অফিস দপ্তর। বর্মার শেষ রাজা থিব-র ভাঙা কবর ঘিরে যত গল্প-কথা ছিল সব বাতিল করে দিয়ে নতুন সরকারী সড়ক চলে এসেছে কলকাতা কেষ্টনগরের বাস ট্রাক নিয়ে।

সামনেই উদ্বাস্তুদের বসতি। রাতে কাজ সেরে ঘরে ফিরতে তাদের ঝি, বৌ-রা এতটুকু ভয় পায় না। মুর্শিদকুলি খাঁ-তে শুরু আর কোম্পানীর জমজমায় শেষ যে সময়টা সেটা একেবারেই মরে গিয়েছে। জঁাকালো গল্প গুজবের ঐতিহ্যও নেই। বড় বড় শিরীষ মেহগনির গাছ, ভাঙাচোরা কুঠি আর সমাধি, সিরাজের মুর্শিদাবাদের মরা জঁাকজমকও যেন এই যুগে নতুন করে মরলো। ভয় নেই, ভূত নেই, ইতিহাস এই নতুন দিনকালের ওপর এতটুকু শেকড় গাড়তে পারেনি।

নতুন গোরস্থানে ঝকঝকে পাঁচিল, সবুজ ঘাসের ময়দান, কেয়ারী করা ফুলবাগান, গুটিকয় সমাধি আর এখানে সেখানে কয়টি তরুণ কৃষ্ণচূড়া শিরীষ, দেবদারু গাছ। মাঝখানে ময়দানটার ব্যবধান। ভাঙাচোরা দিনকালের মরা সাক্ষী ঐ গোরস্থানটাকে দেখে দেখে নতুন গোরস্থানটা বুঝি ব্যঙ্গ করে।

নতুন গোরস্থানের সুপারিন্টেডেন্ট পার্সিভ্যাল ডি-টইট।
শহরের মানুষ বলে পার্সি সাহেব।

মহাযুদ্ধের জখমী মানুষ পার্সি সাহেব আজও রয়ে গেল এখানে।

কেন যে রয়ে গেল তার কারণ খুঁজতে গিয়ে নানান জন নানান কথা কয়। পঁয়তাল্লিশ বছরের জোয়ান মানুষ, হলেই বা তার একখানা পা খোঁড়া, সে কি অন্য কোথাও অন্য চাকরী পেল না? এই মফঃস্বল শহরের ক্রীশ্চিয়ান গোরস্থানের সুপারিন্টেডেন্ট হয়ে কি লাভ হবে? রেলওয়েতে ভাল সুযোগ পেয়েছিল পার্সি সাহেব। গেল না কেন? রেডক্রশে ত' অফিসার হ'তে পারতো। জিয়াগঞ্জের হাসপাতালেও ডেকেছিল একবার পার্সি সাহেবকে।

আসলে অন্য কারণ আছে। কোন কারণে আটকে গিয়েছে সাহেব। আটকিয়েছে ঐ আকাশীর টানে।

মানুষের কাজ নেই তাই কথা কয়। কথা হয় সন্ধ্যেবেলা জজকোর্টের পেছনে শশীর ভাঁটিখানায়। কথা হয় ষ্টেশনে, লক্ষ্মী সা'য়ের মিষ্টির দোকানে। গোরস্থানের মালী গোকুল মান্নাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা হয়। আকাশীর কারণেই যে গোকুল এই চাকরীটা পেল সে কথা আজ আর নতুন করে হয় না। পার্সি সাহেবের ক্যাশবাক্সের সুলুখ সন্ধান যে আকাশী-ই রাখে সে কথাতেও আর মজা পায় না এ শহরের মানুষ।

বর্ষাকাল। বিষ্টি পড়ে একঘেয়ে ভাবে। মশা ভন্‌ভন্‌ করে। লক্ষ্মী সা'য়ের দোকান-ঘরের ঝাঁপের বাতার খুঁটি বেয়ে একটা টিকটিকি ওঠে আর নামে। পাশের কচুবনে বুঝি সাপে ব্যাঙ ধরেছে। ভেকের অন্তিম আর্তনাদ কান পেতে শোনে গোকুল।

বিরাট কাঠামোর ওপর নির্বোধ চেহারা। দেখে দেখে লক্ষ্মী সা বলে—খাসমহলের সব জমি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। তুই পাঁচ কাঠা নে গোকুল।

—টাকা দেবে তুমি ?

—তোর টাকার ভাবনা ?

বলে লক্ষ্মী সা চোখ ছোট করে চেয়ে থাকে। গোকুল যদি জমি কিনতে চায়, এখনই পার্সিসাহেব টাকা দেবে বের করে। এত সুবিধে থাকাত-ও কেন নিজের সুবিধে করে নেয়না গোকুল, লক্ষ্মী সা বোধ হয় সেই কথা-ই ভাবে। বলে—তুই একবার মুখে বললে কত টাকা পাবি।

জবাব দেয় না গোকুল। নিজের মর্মান্তিক জ্বালাপোড়ার কথা আপাতত চাপা দিয়ে ব্যাঙটার মরণ আর্ত্তনাদ শোনাটা যেন খুবই দরকারী। এমনি মুখ ক'রে কান তারিয়ে একটু হেলে থাকে। লক্ষ্মী সা' বলে—হেলে ঢোঁড়া হবে আর কি। যে জল জমেছে। আর তেমনি কি মশার আড্ডা।

গোকুল বলে—আমার যেন মনে হয় জাত সাপ।

—রাতে বলে মরলি গোকুল।

গোকুলের মনে হয় ডোবার পাশের কচুবনে রাজসাপ শাঁখামুটি কালাজকে কতদিন সে গা চিত্তিয়ে চলে যেতে দেখেছে। এখন এই বর্ষার রাতে সেই সাপ-ই যেন ব্যাঙটাকে ধরেছে।

গোকুলের সব আশ্চর্য আশ্চর্য কথা মনে হয়। মনে হয় কতদিনই ত' কচুরশাক কাটতে আসে আকাশী, একবার কি তার পায়ে ছোবল দেবার কথা মনেও পড়ে না ঐ শাঁখামুঠির ? তার পরিচিত সাপটার কথা মনে করে দুঃখ হয় গোকুলের। খল, তবু এত খল এই নাগ জাতি ? তার আহার ব্যাঙগুলিকে ত' সে তাড়িয়ে দিতেও পারতো। সাপটার মাথায় লাঠিও মারতে পারত। গোকুল ত' তার কিছুই করেনি। গোকুল ত' তার বন্ধু। তবু সাপটা আকাশীকে ছোবল দেয় না কেন ?

সাদা চুণকাম করা পাকা বাড়ী গোকুলের। কলাই করা থালায় ভাত বেড়ে দেয় আকাশী। ভাতের পাশে মাছ দেখে গোকুল থালা

ঠেলে দেয়। বলে—তোর সায়েবে মাছ দিয়েছে? আমি খাব. না, যা।

জবাব দেয় না আকাশী। গালাগালি চ্যাঁচামেচি করে গোকুল। আকাশীর গলা শোনা যায় না। সাহেব কোনদিন খট্-খট্ করে ক্রাচ নিয়ে এসে দাঁড়ায়। বলে—কেয়া হুয়া আকাশী?

—কুছ নেহি জী।

—তবে মালী চাঁচাচ্ছে কেন?

গোকুল চোখ লাল করে চেয়ে থাকে। সাহেব বলে—তোমার ঘরে এত গোলমাল কেন হয়?

—আর হবে না সাহেব!

আকাশী নম্রস্বরে বলে। গোকুল ক্ষেপে ওঠে—সাহেব আমার সঙ্গে কথা কইছে। তুই কেন জবাব দিস? পার্সি রেগে যায়। বলে—গোকুল, তুমি বড় গোলমাল কর। আমি তোমাকে ফাইন করব। সিমেট্রির একটা মর্যাদা আছে, তুমি জান?

—আর হবে না জী!

আকাশী-ই বলে।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে দু'টি নর-নারী পরস্পরকে ঘৃণা করে। ভিত্তিহীন আক্রোশের জ্বালা বুকে নিয়ে বিড়ি খায় গোকুল। কচুর পাতায় বৃষ্টি পড়ে একঘেয়ে সুরে। তাই শোনে আকাশী।

অনেক আগে যখন গোকুলকে সে ভালবাসতো, তখন মনে দুঃখ হ'লে কাঁদতো আকাশী।

আজ আর সে কাঁদে না। কাঁদবে কেন? তার চোখের জলের কোন দাম নেই, তাই সে কেঁদে আর নিজের বুকটা ভারী করে না। ঐ কচুর পাতা বেয়ে যে বৃষ্টির ধারা পড়ে, তাতে তলার মাটি ভিজে আমরুল আর ঢেঁকি শাকের বন হয়। খরার দিনে সেই শ্যামলিমাটুকু দেখে বোঝা যায় যে হ্যাঁ, বৃষ্টি হয়েছিলো এখানে আষাঢ় শ্রাবণে! আকাশীর চোখের জলগুলির তেমন কোন দিশা প্রমাণ নেই। তাই

মানুষ এখনকার আকাশীকে দেখে দেখে ভাবে বুঝি চিরকালই অমনই রুক্ষ মানুষ আকাশী।

নিজের আকাশ পাতাল দুঃখের ভাবনার মধ্যে আকাশী নিজে ডুব দিয়ে নিথর হয়ে থাকে।

বকবক করতে করতে মুখে ফেনা উঠে মরে গোকুল। তখন আকাশীই আঁধারে একঘটি জল এগিয়ে দেয়। সে জল ফেলে দেয় গোকুল। নিজে ঢেলে খায়। পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করবার প্রাত্যহিক পালা শেষ হলে তবে ঘুমোয় গোকুল আর আকাশী।

পার্সিসাহেবের সাত কুলে কেউ ছিলনা। খুব ছোটবেলার কথা মনে করতে চেষ্টা করেছে পার্সিসাহেব। আপনার জন কারুকে মনে পড়েনি। মনে পড়েছে রোঁয়া ওঠা, জলে ভেজা একটা নেড়ী কুকুর-ছানার কথা। মনে পড়েছে, গয়াতে তাদের অরফানেজের বারান্দায় কুকুরছানাটা বসে ভিজছিলো বিষ্টিতে।

ভিজতে ভিজতে কুঁই-কুঁই করে ছানাটা তাদের ডর্মেটরীতে ঢুকবার চেষ্টা করছিলো। আর অন্য ছেলে-রা ঢিল মেরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলো।

সন্ধের অন্ধকারে বারান্দার গা বেয়ে বিষ্টির একটা মোটা পর্দা ঝাপটাচ্ছে—সেটা, আর ছেলেদের ঢিল, দুটোর মাঝখানে বাড়ি খাচ্ছিলো কুকুরটা।

পার্সি তখন কুকুরটাকে নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় তুলে এনেছিলো।

ফাদার-কে বলে কুকুরটাকে নিজের কাছে রাখবার অনুমতি আদায় করেছিলো পার্সি।

পঁয়তাল্লিশ বছরের পার্সি যখনই মুখ ফিরিয়ে চেয়েছে, নিজের অতীতের সবটুকুতে সে এক অপূরণীয় নিঃসঙ্গতার শূন্যতাকে হা হা করতে দেখেছে।

চিরদিনই সে নিঃসঙ্গ। শৈশবে ঐ কুকুরটার কথা তার মনে পড়ে। মনে পড়ে সে ছিলো পার্সির সঙ্গী। মনে পড়ে গলায় কাপড়ের পাড় বাঁধা একটা হ্যাংলা চেহারার কুকুরছানা আর একটা রোগা, বড় মাথা, হ্যাংলা চেহারার ছোট্ট ছেলের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পার্সির জীবনটা অমনি-ই রয়ে গেল। এ অরফানেজ থেকে সে অরফানেজ। লেখাপড়া শিখবার সুযোগ আর ভাল করে হলো না।

ছোটবেলার কথা যেটুকু মনে পড়ে, তাতে এটা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সাহেব পাদ্রী-রা তাদের মতো সঙ্কর ছেলেদের কি রকম নীচু চোখে দেখতো। জাত সাহেব আর ভেজাল রক্তের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ ব্যবধান আছে, সেটা তাদের ব্যবহারে সোচ্চারিত হয়ে উঠতো।

সাহেব পাদ্রী-রা তাকে কোনদিন-ও নিজেদের পর্য্যায়ে তোলেনি। তুলবে কেন ?

পার্সি-সাহেব জাতে কি ? ভাবতে বসলে তার-ই যে বিভ্রান্ত লাগে। কেমন করে কোন প্রক্রিয়ায় জৈবিক কোন নিয়মে পার্সি সাহেবরা এই পৃথিবীতে আসে—সে এক অনাদি অনন্ত কলঙ্কিত ইতিহাস।

চা-বাগান, বা কয়লাখনি-র সাহেব-রা সুন্দর, ডাঁটো সব কুলী-কামিন মেয়েদের ঘরে ডাকে। আসতে হয়তো পা জড়িয়ে যায়, ভয়ে মনটা গুটিয়ে যায়—তবু সাহেবদের সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই তাদের।

চিরপুরাতন এক অধ্যায়ের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি হয় অন্ধকার ঘরে। তারপরে জন্ম নেয় পার্সি সাহেবদের মতো আরো অনেক মানুষ।

চেহারাটা যদি ভুলে পিতৃকুলের দিকে উৎরে যায়, তবে তাদের ঠাঁই হয় অরফানেজে।

অরফানেজে এইসব ছেলেরা খালি পেটে বাইবেল মুখস্থ করে বড় হয়।

তারপর—রেলওয়ে বা এখানে সেখানে নিচু মাইনের কাজ খালি হলে ছুই প্রস্থ সার্টপ্যান্ট, একখানা বাইবেল, আর ফাদারদের আশীর্বাদ নিয়ে চাকরিতে গিয়ে ঢোকে। এক সময় সাহেবদের কোয়ার্টার ঘেঁষে ফিরিঙ্গীদের কোয়ার্টার থাকতো। ফিরিঙ্গীরা সেদিন নিজেদের এই সাহেবদের-ই জাত ভাই বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করতো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাতচল্লিশ সাল থেকে সে কৌলীণ্যের গর্বটুকুও ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

পার্সিসাহেবরা এখন আরো কোন ঠাসা। সমাজে তাদের চলবার ফিরবার ঠাঁই আরো সঙ্কীর্ণ।

আজকাল অসুখ হলে তাদের জন্যে সরকারী হাঁসপাতালের চ্যারিটি ওয়ার্ড। মরলে কবরখানায় ক্রসহীন বারোয়ায়ী পাড়া।

পার্সি কিন্তু ছোটবেলা থেকেই নিজের আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিলো।

বাইবেল পড়তে ভালো লাগতো তার। সে বিশ্বাস করতো, সৎপথে থাকলে, সৎবিশ্বাস নিয়ে বাঁচলে সে একদিন মানুষের মর্যাদা পাবে। একটা সম্মানের জীবন যাপন করতে পারবে।

সে তাই ভদ্রভাবে চলতো। সঙ্গীদের কুৎসিত ঠাট্টাতামাসায় যোগ দিত না।

ফাদার ইমানুয়েল মেজাজ ভালো থাকলে বলতো—Good blood. Though a b—.

তখন অজ্ঞাত জন্মদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পার্সির মনটা ভরে যেত। ফাদারদের প্রতি ভক্তি হতো।

সেই মনটা কি একদিনে ভেঙেছে? ভেঙেছে তিলে তিলে—একটু একটু করে।

জৌনপুরের গার্ডসাহেবের বোন মার্গারেটের কথা মনে পড়ে।

পার্সিকে সে ভালোবেসেছিল। অন্তত পার্সি তাই মনে করেছিল।

পার্সিকে সে বলেছিল

—আমি তুমি মিলে সুন্দর একটি ঘর বাঁধব। আমরা ঘরের জানালায় রঙীন পর্দা টানাব। টবে ফুলবাগান করবো। সারাদিন পর তুমি যখন কাজ করে ঘরে আসবে, আমরা দুজনে বসে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়ে শুনবো।

পার্সি সেই সুখের ছবিটিকে ধ্রুবতারা স্থির রেখে টাকা জমিয়ে চলেছিলো। গ্রামোফোনও কিনেছিলো একটা।

কিন্তু মার্গারেট সহজেই সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল। রেলওয়ে ওয়ার্কসপের ফোরম্যানকে বিয়ে করে সে সহজে-ই ভুলতে পারলো পার্সি-কে।

মনে মনে যত অভিযোগ আর অভিমান জমা হয়েছিলো মার্গারেটের আনন্দিত উজ্জ্বল মুখখানি দেখে সে সব ক্ষমা করতে পারলো পার্সি।

বিয়ে করবার জন্যে তাকে আর কেউ অনুরোধ করেনি। পার্সি-ও আর বিয়ের কথা ভাবেনি। বরঞ্চ তার মনে হয়েছিলো, জন্ম থেকে এই নিঃসঙ্গতা-ই তার উত্তরাধিকার এবং ভবিতব্য-ও বটে। একে এড়িয়ে, একে ছাড়িয়ে তার আর একটা মুখর পৃথিবীতে উত্তীর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

তারপরে-ও সে বাঁচতে চেষ্টা করেছে। সঙ্গী খুঁজে পেতে চেয়েছে, মনের মত একজন বন্ধু কামনা করেছে।

এই শহরটায় যখন এলো সে—নতুন কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর চার্চের অরফানেজটার ভার প্রাপ্ত রেক্টর হয়ে—তার খুব ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল এখানে সে একটা মনের মতো পরিবেশ পেতে পারবে।

এই কবরখানা। কবরখানার মাঠে সারি সারি শয়ান মানুষগুলি-সকলের প্রতি সে এক ধরণের দায়িত্ববোধ করেছিলো।

তাই সবটুকু ভালবাসা ও যত্ন সে এই সাদাকালো পাথর ও সিমেণ্টের ফলকগুলির ওপর ঢেলে দিয়েছিল। সেগুলি যাতে পরিষ্কার থাকে, বাগানে যাতে আগাছা না জন্মাতে পারে—কবরখানার মাঠে গরু ছাগল চরিয়ে মৃতদের প্রতি যেন কেউ অবমাননা না করে—এইসব দিকে তার লক্ষ্য থাকত।

কিন্তু মানুষ কি শুধু পাথর আর মাটি-কে, মৃত আর মৃতের জগৎকে ভালবেসে তৃপ্তি পায়? শান্তি পায়?

পার্সি তাই রক্তমাংস চামড়ায় ঢাকা উত্তপ্ত এক হৃদয়ের স্পর্শ পেতে চেয়েছিল।

অরফানেজের ছেলেগুলিকে সে ভালবাসতে চাইত, কিন্তু তারা তাকে অবিশ্বাস করত। অরফানেজের ছেলে-রা ভালকথা শুনে, বা ভালব্যবহার পেয়ে অভ্যস্ত নয়।

তারপরে পার্সি একটা কুকুর পুষতে চেষ্টা করেছে। কুকুর, বেড়াল খরগোস, পাখি—পার্সি বারবার তার নিঃসঙ্গ জীবনটাতে একটা না একটা অবলম্বন পাবার চেষ্টা করেছে।

আকাশী আর গোকুল যেদিন এসে দাঁড়ালো—পার্সি কি জানতো এই মানুষ দুটো তার জীবনের সঙ্গে এতখানি জড়িয়ে যাবে?

সে জানিতো না। সে আকাশীর মিনতিভরা বড় বড় চোখদুটি শুধু দেখেছিলো। আকাশী তার পায়ের ওপর হাত রেখে বলেছিল

—মালীকে তুমি কাজ দাও সাহেব—আমি তোমার সব কাজ করে দেব। তুমি শুধু আমাদের একটা কাজ দাও একটা আস্তানা দাও।

গোকুলকে কাজ দিলো পার্সি—তাই নিয়ে কথা উঠেছিল কমিটিতে। গোকুল যে দাগী চোর, সে যে দুবার জেল খেটে এসেছে—এই সব কথা।

পার্সি সেদিন কমিটি-তে দাঁড়িয়ে অনেক কথা বলেছিলো গোকুলকে সমর্থন করে। বলেছিলো,

—যে অপরাধ করেছে, তাকে কলঙ্কিত করে যদি দূরে সরিয়ে রাখি তা হ'লে কি আমরা নিজেরা-ই অপরাধি হব না? অপরাধিকে টেনে আনতে হবে সমাজের মধ্যে—তাকে ভাল হবার সুযোগ দিতে হবে।

গোকুলকে চাকরি দিতে রাজি হলো কমিটি। তবে পার্সি কথা দিলো, চাকরী যখন স্থায়ী হবে, এই পদটি পার্মানেণ্ট করবার আগে কমিটি আবার বিবেচনা করে দেখবে যে গোকুল-ই এই পদের উপযুক্ত লোক কিনা!

পার্সি সেদিন এসে গোকুলকে বলেছিলো

—মালী তুমি ভাল করে কাজ কর। তোমার কথা আমি কমিটিতে অনেক বলেছি।

আকাশী বলেছিল,

—কাজ ও ভাল করে করবে সাহেব, আমি কথা দিলাম।

আকাশী বেশী কথা বলতে পারে না। তাদের কাজ দেবার জন্য, আশ্রয় দেবার জন্য। পার্সিভালের প্রতি কৃতজ্ঞতা তার উছ্‌লে উছ্‌লে উঠতো। সে কৃতজ্ঞতা কোন্ ভাষায় জানাবে আকাশী? মুখে তার বেশী কথা ফুটলোনা বটে—তবে সেবায় যত্নে রইলো তার কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর।

পার্সি জানতেও পারল না, কবে কেমন করে তার সকল কাজের, সকলসেবা যত্নের ভার চলে এল আকাশীর ওপর।

যে পার্সি জীবনে কারুর ওপর এতটুকু জোর করেনি—সে আকাশীর ওপর এতখানি দাবী জানাবার অধিকার কোথাথেকে পেল? পার্সি সে কথা কোনদিন-ও ভেবে দেখলনা।

আকাশী সকালে চা করে দেয় পার্সিকে—ঘর দোর পরিষ্কার করে—জামাকাপড় গুছিয়ে দেয়। তারপর কোনমতে নিজের গৃহস্থালীর সামান্য কাজ সেরে সাহেরের রান্না করে দেয়—স্নানের জল তুলে দেয়। কোন কোনদিন সন্ধ্যাবেলা সাহেবের পা-য়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

পার্সি শুধু দেখে, কেমন করে যেন, এই প্রৌঢ় বয়সে—সে এই মেয়েটির কাছে স্নেহমমতার বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছে।

বড় নিশ্চিন্ত লাগে পার্সি-র। বড় ভাল লাগে।

কিন্তু গোকুল মান্নার মনের অনুভূতিগুলো বড় জটিল, বড় দুর্গম অতলে তাদের রাস্তা হারিয়ে গিয়েছে।

পার্সিসাহেব ইস্টার বা বড়দিনে গোকুল ও আকাশীকে নতুন কাপড় কিনে দেয়।

তার কোয়ার্টারে যখন ইলেকট্রিক আসে সঙ্গে সঙ্গে মালীর ঘরে বিজলী বাতি জ্বলে।

পার্সির সামান্য উপার্জন, সামান্য সঞ্চয় এমনি করে আকাশীর প্রয়োজনে সার্থক হয়।

শহরের মানুষ নানা কথা বলে। গোকুলকে গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে,

—এবার না কি তোর বৌ-কে বালা গড়িয়ে দিল সাহেব ?

—তোরে নাকি পাকা বাড়ী করে দেবে সাহেব ?

—তোদের ঘরে না কি টিপকল বসিয়ে দিল সাহেব ?

শোনে আর ভোঁতা, বিশ্রী একটা অক্ষম রাগ গর্জাতে থাকে গোকুলের মনে। গোকুল সাহেবকে বলতে ভরসা পায় না। আকাশীর সঙ্গে ঝগড়া করে। আর সাহেবের ওপর শোধ নেয় অন্যভাবে।

সাহেব তার হয়ে বড় গলায় কথা দিয়ে এসেছে। কথা দিয়েছে যে গোকুল কখনো বেইমানী করবে না। ভাল করে কাজ করবে।

গোকুল তাই কাজে গা ঢিলে দেয়।

রেগে যায় সাহেব, আর আকাশী যখন গোকুলকে বকে, গোকুল মনের কুৎসিত সন্দেহের বিষটা একেবারে ঢেলে দেয়।

—তবে ঐ সাহেবের সঙ্গে তোর নষ্টামি। লোকে যা বলে তা মিথ্যে নয়।

আশ্চর্য হয়ে আকাশী প্রথম প্রথম গোকুলকে বোঝাতে কত-চেষ্টা-ই না করেছে। দুদিন, চারদিন, ভাল গিয়েছে। তারপরে আবার, তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ একটা কারণ ধরে গোকুল আবার ক্ষেপে উঠেছে।

আকাশীর ওপর মালীর এ অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি পার্সি। সে ক্রাচে ঠকঠক করে নেমে এসেছে। বলেছে

—মালী, তুমি বড় বেইমান। তোমাকে আমি রিপোর্ট করে বরখাস্ত করবো।

তখন আকাশী এসে হাত পা ধরে পার্সিকে বুঝিয়েছে।

এমনি করে চলতে চলতে একদিন একটা অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

আজ আর গোকুল আকাশীকে বিশ্বাস করে না। অথচ ছাড়তেও পারে না তাকে।

আকাশী গোকুলকে ছাড়তে পারে না। পার্সির সঙ্গে-ও তার মন বড় কঠিন পাকে বাঁধা। ঐ মানুষটার চোখে, যে আলোটুকু জ্বলে, আকাশী জেনেছে—তার উৎস সে নিজে।

সে আলোটুকু নিভিয়ে দিয়ে মানুষটাকে আবার একটা নিঃসঙ্গের অন্ধকারে নির্বাসিত করবার কথা আকাশী ভাবতে পারে না।

এমনি করে এগিয়ে চলে দিন। দিনে দিনে জটিলতা বেড়ে-ই চলে। আঘাত বুকে নিয়ে নিয়ে আকাশী আজ এক পাথরের কন্যা।

গোকুল তাকে ছাড়বে না। আর পার্সি?

পার্সির জীবনে আজ ঐ মালী বৌ আকাশী ছাড়া অন্য কোন মুক্তি নেই, অন্য কোন আশ্বাস নেই।

আকাশী ভাবে গোকুল মাত্র এ কথা কেন বোঝে না, যে তার আর সাহেবের মধ্যে বাঁধন টুকু শুধু—মমতার, শুধু স্নেহের।

পার্সি ভাবে এই স্নেহমমতা এ-ও প্রেমের-ই আর এক ভাষা। সে কথা কি আকাশী জানে? আকাশী কি নিজের মন বোঝে?

আর গোকুল? গোকুলমান্না কারু কাছে নিজেকে ধরা দেয় না। সে শুধু গর্জে গর্জে গুমরে মরে। আর শোধ নেয় ঐ কবরগুলোর ওপর। জল দেয় না ঘাস ছাঁটে না—কাজ ফেলে রেখে চুপ করে বসে থাকে।

কুঠির বারান্দায় বেতের টেবিলে বসে চা খায় পার্সি। বারান্দার নিচের দোপাটি গাছগুলোতে জল দেয়। আকাশী এসে সেলাম করে দাঁড়ায়। বলে, রাতে কি রান্না করবো?

—লুচি আর আলুর দম।

তারপর বলে,—আকাশী, মালী কোথায়?

—কেন হুজুর?

—কাল চিঠি এসেছে হাঁসপাতাল থেকে। ডাক্তার সাহেব লিখেছেন কোন-ও গ্রেভে জল দেয় না মালী, ঘাস সাফ করে না।

বলতে বলতে চটে যায় পার্সি। বলে, বেইমানের কাজ কর তোমরা। আমি চারদিন কলকাতা গিয়েছি আর অমনি ফাঁকি দিচ্ছ?

খট খট করে নেমে আসে। বলে—মালী!

খুরপী নেই, টুকরি নেই, হাত দিয়ে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাশে রাখছে গোকুল। দেখেই আরো রেগে যায় সাহেব। বলে, তুম্ পানি কেঁও নেই দেতা?

ছড়ি দিয়ে কবরগুলোর ওপর ঠুকতে থাকে। বলে, পানি নেহি দেতা সাফা নেহি করতা, জরুর বরখাস্ত করেংগে।

মাথা গরম করে রিপোর্ট লিখতে চলে গেল পার্সি। অকৃতজ্ঞ গোকুলকে সরিয়ে দিলে, এমন চাকরি নেবার জন্যে কত জন ত' বসেই আছে।

চৌকির নীচ থেকে খুরপীখানা তুলে নিয়ে বেরুচ্ছিলো আকাশী। তার হাত চেপে ধরলো গোকুল। বললে—, অমনি চলছিস কেমন?

—হাত ছাড়্।

—যেতে দেব না তোকে আমি। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালো আকাশী। বললো—তোর লাজলজ্জা নেই, তাই সায়েবের ওপর রাগ করিস। তুই চোখের চামড়া খেয়েছিস। মনে পড়ে না?

—এই গ্যাখ্ আকাশী! বলে রুখে উঠল গোকুল। মস্ত বড়ো নড়বড়ে শরীরখানা শক্ত করে বললো,—ওই সায়েবের সঙ্গে পীরিত করা ঘুচিয়ে দোব। এই কোদাল দিয়ে সাহেবের মাথা ফাঁক করে জেলে যাব জানিস?

—তুই এমন বেইমান? তুই-ও বললি এ কথা?

গোকুলের বেইমানী তাহলে আকাশীকে আজও এতটুকু দাগা দেয়? ক্ষণিকের জন্যে যেন বিমূঢ় হলো গোকুল। তার পরই বেরিয়ে গেল।

ঘাস-আগাছা তুলে টুকরি বোঝাই করতে করতে অনেকদিন বাদে গোকুলের কথায় কাঁদলো আকাশী। জেল-ফেরৎ চোর গোকুলের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল যেদিন, সেদিন থেকেই ত' দুঃখ সুরু। কেউ চাকরী দেয় না। দিলো এই পার্সি সায়েব। কৃতজ্ঞতার ঋণে বাঁধা পড়েছে আকাশী। গোকুল সেকথা বোঝে না। পার্সি সাহেবের ওপরেই তার রাগ।

ঘাস তুলে জঙ্গল সাফ করতে সন্ধ্যে গড়ালো।

সাহেবের খাবার তৈরী করে ঘরে নিয়ে সাজিয়ে দিলো আকাশী। রাগ পড়লে সাহেব মাটির মানুষ। বললো,

—রিপোর্ট ছিঁড়ে ফেললাম আকাশী। কিন্তু গোকুলকে তুমি শায়েস্তা করতে পারো না?

আকাশী আজকে আর এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না। কেমন করে সে বলে যে গোকুলের ওপর তার আর কোন জোর নেই। আর কোন দাবী-ই খাটবে না।

যে গোকুল একদিন তার হাত ধরে পার্সির বাংলোয় এসেছিল—তার সঙ্গে ঐ বেইমান গোকুল মান্নার অনেক অনেক তফাৎ।

পার্সি আবার বললো,—কেন এত সহ্য করো তুমি?

কপালে হাত দিয়ে আকাশী বোঝালো এই তার নসিব।

সহ্য করতে তাকে হবে-ই। যাকে আপন বলে জেনেছিল সে মানুষটা আজ বোঝা হয়ে উঠেছে। আর যে পর, সেই সাহেব আজ তার পরম বন্ধু। এই দুইজনকে নিয়েই চলতে হবে আকাশীর।

তার চোখ দেখে-ই যেন সাহেব বুঝলো।

সাহেবের নিঃসঙ্গ বুকখানায় কিসের যেন ঢেউ লাগলো। পার্সি একটু নিচু হলো, বললো—ও হতভাগা বোঝে না আমিও ত' চাকর। আমাকেও জবাব দিতে হয়।

—কত বার বাঁচাবেন হুজুর?

আকাশীর বিষাদ-মলিন চোখ দুটি দেখে ধৈর্য হারালো পার্সি। বললো—তোমার দুঃখ আমি দেখতে পারি না আকাশী। তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না।

আকাশীর কপালে, চুলে, চোখে আঙ্গুলগুলো বুলিয়ে অস্থির হয়ে উঠলো পার্সি। আকাশী যদি সাড়া দিতো তাহলে আত্মবিস্মৃত হতে বাধতো না তার। আকাশী কিন্তু মাথা তুললো না, বললো,

—এক নসীব দুঃখ আমি নিয়ে জন্মেছি সাহেব। তুমি তার কি করবে?

—মালী তোমাকে এত দুঃখ দেয়, তাকে তুমি ছাড়তে পারো না আকাশী? মিশনে তোমাকে কাজ দেব আমি। পারো না?

—পারি না, সাহেব।

—পারো না, তাই না আকাশী?

ঘাড় নাড়লো আকাশী। কেন পারে না সেকথা আর শুধোল না সাহেব! আকাশীর দিকে চেয়ে তার মনে হলো যে সব প্রশ্নের জবাব হয় না, অথচ প্রশ্ন জেগে থাকে, তাদের ক্লান্তি যেন গুরুভার করে তুললো এই পরিবেশ।

নিঃশব্দ ঘর। মশা গুন্‌গুন্‌ করে। বাইরের কচুবনে রাজসাপ, শাঁখামুটির বুঝি ব্যাঙ ধরবার সময় হলো। সর সর শব্দ করে চলে যাচ্ছে সেই সরীসৃপ। সে শব্দ চিনতেও দেরী হলো না পার্সির। সহসা মনে হলো ক্লান্ত, পরম ক্লান্ত সে। বললো,

—তুমি যাও আকাশী। আর কিছু করতে হবে না আজ।

সেলাম করে চলে গেল আকাশী। অনেকদিন বাদে আজকে গ্রামোফোনটা খুললো পার্সি। ক্যানকেনে হয়ে গিয়েছে র‍্যামোনা-র রেকর্ড। অনেক বছর আগে—যখন মনে হয়েছিলো মার্গারেট একদিন আসবে তার ঘরে, সেদিন এই রেকর্ড কিনেছিলো পার্সি। পঁচিশ বছরের মনটা বেশ ছিলো। এখন সব কিছুই যেন ক্লান্তিকর, বিবর্ণ। মার্গারেটের স্মৃতিতে ছাতা ধরেছে। রেকর্ডটা তার সঙ্গে তাল রেখেই হয়েছে ক্যানকেনে। ছিট কাপড়ের পর্দা টাঙিয়ে, টবের গাছে জল দিয়ে ফুল ফোটানো এ জীবনে আর হলো না পার্সির। তার ঘরের জানালায়, বাঁশের খাঁচায় ক্যানারি পাখি কোনদিন শীষ দিলো না। যে নিঃসঙ্গতা পার্সি সারাজীবন ভয় করেছে, এড়িয়ে চলতে চেয়েছে, সে নিঃসঙ্গতার অভিশাপ-ও তার ঘুচল না।

টিউবওয়েলের জল পাম্প করে চৌবাচ্চাটা ভরছে আকাশী। সে শব্দ পার্সি বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুনতে পেল। একবার মনে হলো বারণ করে। বলে—অমন কষ্ট তুমি করো না আকাশী।

কিন্তু বললো না। মেয়েরা অমন কেন হয়? গোকুল মদ খেয়ে ফিরবে রাত করে। সারা দিনের ক্লান্ত শরীরে এখনো আকাশী জল ভরবে? এই জল পাম্প ক'রে ধোবে কবর? ভয় করে না আকাশীর? আর কিছু না হোক, সাপের ভয়? না কি সব ভয়-ই জয় করেছে আকাশী ঐ গোকুল মান্নার মুখের দিকে চেয়ে?

সে-রাতে গোকুল আকাশীর মধ্যেও কোন একটা বোঝাপড়া হলো। সম্ভবতঃ দুই নরনারী পরস্পরের মনের কাছাকাছি এসেছিলো

অনেক দিন বাদে। দেখা গেলো, চুল আঁচড়ে, দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়েছে গোকুল। কবরগুলি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছে। গোরস্থানের বাগান পরিষ্কার করছে দু'জনে হাতে-হাতে। এক দিন দুপুরে দেখা গেলো, কবরের গায়ের লেখাগুলিতে কালি বুলিয়ে উজ্জ্বল করছে গোকুল। রঙের টিন ধরে বসে আছে আকাশী। সন্ধ্যেবেলা বেরুবার ঝোঁকে ভাঁটা পড়লো গোকুলের। সাহেবের সঙ্গে ব্যবহারে নম্রতা দেখা দিলো।

দেখে খুসী হলো পার্সি। বললো,

—মালী, তুমি কাজ ভালো করছ। তোমাকে আমি মাইনে বাড়িয়ে দেব।

গোকুল ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে হাসলো। তারপর, যারা বেশী কথা কইতে জানেনা—ভাষার সঞ্চয় যাদের বেশী নেই—সেই সব মানুষের মতো বোকা বোকা মুখ করে বললো

—রামলালের দোকানে নতুন রঙের কৌটো এসেছে। একটা নিয়ে এলে পরে বেশ নীলসবুজ রঙে হরফগুলো বুলিয়ে দিই। মেয়ে ইস্কুলের বড়দিদির কবরে লেখাগুলো ফিকে হয়ে এসেছে।

—কবরে কালো ছাড়া অন্যরঙ চলেনা মালী। তোমাকে আমি ভালো রঙ এনে দেব। তুমি রঙ করে দিও। জানলে?

গোকুল হেসে স্বীকার ক'রে কাজে চলে গেল।

আকাশী সেদিন রাতে খাবার দিতে এসে হাসিমুখে বসে পড়লো সাহেবের পায়ের কাছে। বললো

—জুতোটা বদলাতে হবে সাহেব, আর চলে না।

—আচ্ছা।

—আর নতুন জামা কিনতে হবে। সব ছিঁড়ে গিয়েছে।

—আচ্ছা আকাশী।

আকাশী এবার পার্সির খোঁড়া পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। পার্সি হাসতে হাসতে বললো

গোকুলকে আমি কতবার শাস্তি দেব ভাবি'। কিন্তু তুমি এত ভালো আকাশী—তোমার মুখ দেখে সব ভুলে যাই। বড় ভালো তুমি।

আকাশী তখন বলে ফেললো তার মনের কথা। বললো

—সাহেব, মালীকে পার্মানেন্ট করে দাও। তা'হলে ও আর কোনদিন, কোন বেইমানী করবে না।

পার্সি বললো

—নিশ্চয় দেব। আমাকে কমিটির মানুষ কতবার বলেছে গোকুল চোর, গোকুল বেইমান, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনিনি। আমি ভেবেছি, যাকে কেউ বিশ্বাস করে না, তাকে বিশ্বাস করতে হবে। যাকে কেউ ভালো বাসে না তাকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসলে, তবে না মানুষকে ভালো করে তুলতে পারব আমি? এইসব ভেবে আমি ঠিক করেছি গোকুল-কে পার্মানেন্ট করব। তা'লে গোকুল বুঝবে, আমি ওর বন্ধু। ও আর বেইমানী করবে না।

আকাশী ঘাড়নেড়ে সুখের হাসি হাসলো।

শুধু কি মাইনে বাড়ানো নিয়ে? গোকুলকে পার্মানেন্ট করবার ব্যাপার নিয়ে পার্সি-কে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হলো। মফঃস্বল শহরের মানুষ-রা একটু প্রাচীনপন্থী, একটু রক্ষণশীল। একজন দাগী অপরাধীকে এমন একটা দায়িত্বের কাজ দিতে তাঁদের বাধলো। তাঁরা যুক্তি তর্কের ঝড় তুললেন।

পার্সি কয়দিন ধরে এই নিয়ে-ই মেতে রইলো। তার স্নান আহারের সময় ঠিকানা রইলো না। কমিটির মেম্বারদের প্রত্যেকের বাড়ীতে গেল সে। কাকুতি মিনতি করে বললো, বুঝিয়ে বললো—তার নিজের দায়িত্বে যে সে এই ঝুঁকি নিচ্ছে, সে কথা-ও বললো।

পার্সি সকলেরই প্রিয়। সকলেই তাকে ভালবাসে। তার সততা, তার আন্তরিকতা, ধর্মবিশ্বাস, নম্রতা—এই গুণগুলো দেখে এ শহরের মানুষ বুঝেছে, যে পার্সি অন্তরে অন্তরে খাঁটি সোনা।

অরফানেজের ছেলেদের নিয়ে সে কতরকম কাজ-ই না করেছে। তাদের জন্য আনন্দ দিয়ে, খেলা দিয়ে, শিশুদের একটা সুন্দর জগৎ গড়তে চেষ্টা করেছে।

আবার এই জেলাতে যখন দুর্ভিক্ষ নেমেছিল তখন পার্সি অগ্রণী হয়ে রেডক্রসের সাহায্যে কতরকম কাজ-ই না করেছে।

রাস্তা বাঁধাবার সময়ে, শিশুদের পার্ক তৈরী করবার সময়ে—যখন যে এসেছে—পার্সি তার সামান্য উপার্জন থেকে অকাতরে চাঁদা দিয়েছে।

আজকে, পার্সি যখন গোকুলের হয়ে সকলকে অনুরোধ করলো, তখন তাঁরা, কমিটির মেম্বার-রা খুব সহজে প্রস্তাবটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না।

আর কেউ নয়, পার্সি বলেছে, এই কারনে-ই ব্যাপারটার গুরুত্ব বেড়ে গেল।

কমিটি মিটিংয়ের দিন পার্সি বেরুবার সময়ে গোকুলকে বললো

—মাল্লী তোমার জন্যে চেষ্টা করতে চললাম আমি। যেমন করে হোক, পার্মানেন্ট আমি তোমাকে করবো-ই। তবে তুমি তার মর্যাদা রেখ।

কমিটি মিটিং-এ যুক্তি তর্কের ঝড় বইল। পার্সি যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন ঘরের আবহাওয়াটা থমথমে।

পার্সি যুক্তি তর্কের পথ ধরলো না। সে বলতে সুরু করলো ভাঙা গলায়, টুকরো টুকরো কথায়।

—আমি যেদিন আপনাদের মধ্যে এসেছিলাম, আপনারা আমাকে সাদরে, সযত্নে বুকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বলতে বলতে পার্সির বুকের ভেতর যেন একটা কোন আগল্ খুলে গেল। যে কথাগুলো সে বলতে চেয়েছে, রাতে শুয়ে শুয়ে চিন্তায় যে কথাগুলোকে ধরতে চেয়েছে—সেইসব কথা, সেইসব ভাবনা বেরিয়ে এলো স্বচ্ছন্দে। এমন আবেগ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে কথাগুলো সে বলতে পারবে, পার্সি তা নিজে-ও জানত না।

—গোকুলমান্না অপরাধী। কিন্তু সমাজ যদি ভালোবেসে, ক্ষমাকরে, এদের বুকে তুলে না নেয়, তবে এইসব হতভাগ্য দাঁড়াবে কোথায়? আমি মূর্খ, আপনারা বিদ্বান। আপনারা অনেক জানেন। আমি শুধু জানি, আমাদের যীশু এইসব পাপীতাপী-দের জন্যে-ই প্রাণ দিয়েছিলেন। যে ভালো, যে সৎ, তাকে ভালোবাসা সহজ। সেখানেই কি আমাদের মহত্ব? আমাদের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা? যে পাপী, তার-ই ত ভালোবাসা প্রয়োজন। তাকে ভালোবাসতে পারলে, তবে-ই আমাদের মনুষ্যত্ব সার্থক।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মানুষটি বড় ভালো। পার্সি-র কথাগুলি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে মনে হলো।

পার্সি যখন ঘর্মাক্ত মুখ, ঘাড়, গলা মুছে চেয়ারে বসলো, তখনই সে বুঝলো যে কঠোর একটা পরীক্ষা সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। আজকের সংগ্রামে সে বিজয়ী।

এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে গোকুলের চাকুরী পাকাপাকি হলো। মুখে কিছু বলেনি পার্সি। তবু আকাশী জানতো, পার্সির এই সমস্ত উদ্যম, সব কিছুর উৎস সে নিজেই। এসব কথা বুঝতে মেয়েদের লেখা-পড়া শিখবার দরকার হয় না। প্রেম, তা সে যে রূপ ধরেই আসুক না কেন, মেয়েরা ঠিকই চিনতে পারে।

যুদ্ধে জয় সম্পূর্ণ হলে আনন্দিত চিত্তে ফিরলো পার্সি। জোর গলায় ডাকল—আকাশী! আকাশী!

ছুটে এলো আকাশী। পার্সি বললে,

—গোকুল পার্মানেন্ট হয়ে গেলো আকাশী। পঞ্চাশ টাকা মাইনে হলো।

পরম কৃতজ্ঞতায় সাহেবের পায়ে মাথা রাখলো আকাশী। আজকে যেন রোজকার শাসন না মানলেও চলে, এমনি ভাবে আকাশীর মুখখানা তুইহাতে তুলে ধরলো সাহেব। বললো—মালী বড় বেইমান আকাশী। কিন্তু তুমি বড় ভালো। এখন আর মালী বেইমানী করবে না তাই না?

মাথা নাড়লো আকাশী। সাহেবের পঙ্গু পা-খানায় হাত বোলাতে বোলাতে সে হাসলো। বললো—সাহেব, তুমি দেবতা।

—না আকাশী, আমি মানুষ।

সাহেবের কাঁচাপাকা চুল, শীর্ণ মুখে করুণ হাসি, দেখে এমন মমতা হলো আকাশীর। সেই এক আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে তু'জনে তু'জনকে দেখে বিহ্বল হয়ে গেলো। এর চোখ ওর চোখে অনেক কথাই কইলো। যা মুখে কওয়া যায় না।

জানলা দিয়ে তাই দেখে সরে গেল গোকুল।

সে-ও সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসছিল। কিন্তু সাহেবের তুইহাতে আকাশীর মুখখানা ধরা—আর তুজনের চোখ তুজনের দিকে চেয়ে জলে টলটল করছে, এই দেখে সে সব ধরে ফেললো। বুঝেছে সে। গোকুলকে স্থায়ী না করলে আকাশীকে হাতে পাবে না সাহেব। তাই এত কিছু।

সমস্ত সঙ্কল্প তার কোথায় ভেসে গেল। মাথায় জ্বলে গেল আগুন। শশীর ভাঁটিখানায় গিয়ে ঢুকলো গোকুল।

ভাঁটিখানায় মাতলামি করে হল্লা করবার জন্যে গোকুল গেল থানায়। আর ওদিক পার্সিকে কেন্দ্র করে কথা উঠলো সর্বত্র।

কমিটিতে যাঁরা বিপক্ষে ছিলেন, তাঁরা এবার সোরগোল তুললেন। যে লোকটা পার্মানেন্ট করবার তিনদিনের মধ্যে-ই এইরকম ব্যবহার করতে পারে, তার হয়ে পার্সি বড় বড় কথা কেন বলেছিল? এমন

ইংগিত-ও শোনাগেল, ঐ আকাশীর টানেই পার্সি জেনেশুনে একটা খারাপ লোককে সমর্থন করেছে।

বিপন্ন পার্সি ছাড়িয়ে আনলো গোকুলকে। সাহেবের হয়ে আকাশী-ও গলা তুললো উঁচুতে। বললো।—অমন মানুষের পায়ের তলায় মাটি হয়ে থাক্ না কেন তুই ?

সাহেব বললো—বেইমান, তুমি আবার শয়তানি করছো ?

—বেইমান বলো না সাহেব।

রাগে পাগল হয়ে গেলো সাহেব। ছড়ি দিয়ে মারলো গোকুলের নাকে। বললো—তুম্ হারামী আদ্‌মী হ্যায়। পানি কেঁও নাহি দিয়া ? বাগিচা কা কাম নেহি কিয়া ?

সাহেবের ক্রাচটা চেপে ধরলো গোকুল। চাকর আর জমাদার ছাড়িয়ে দিলো গোকুলকে। রাগে ফুঁসতে থাকলো গোকুল।

চেঁচিয়ে বললো

—শোধ নেব। জেনে রেখ গোকুলমান্নাকে তুমি চেন না সাহেব।

গোকুলের প্রতিশোধ নেবার প্রক্রিয়াটা যে কতখানি অভিনব হবে বুঝতে পারেনি আকাশী। দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলো অনেক দিন বাদে। ঘুম ভাঙলো সাহেবের চীৎকারে। শুধু সাহেব নয়, আরো কয়জন চ্যাঁচাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে হতভম্ব হল আকাশী। গোরস্থানের সদর দরজা খোলা। একপাল গোরু ছাগল এনে ছেড়ে দিয়েছে গোকুল। বাগান ভেঙেচুরে, ঘাস খেয়ে তছ্‌নছ্‌ করেছে তারা। গোরু তাড়িয়ে আনতে না পেরে গোয়ালারা যতো চ্যাঁচাচ্ছে, সাহেব চ্যাঁচাচ্ছে তার চেয়েও বেশী।

রাগে দুঃখে আকাশী যেন জ্বলে গেল। মাথায় বাড়ি মেরে শোক করতে বসবার সময় নয়। নইলে সে লোহা ভেঙে শোক করতে বসতো। এত নীচ গোকুল ? এত ইতর !

আকাশী আর গোয়ালাদের চেষ্টায় গোরু-ছাগল বেরোল গোরস্থান থেকে। অবস্থা দেখে ভয়ে বুক তার শুকিয়ে গেল। একটা ঝড় যেন বয়ে গিয়েছে গোরস্থানটার ওপর দিয়ে। মেহেদি পাতার ক্রুশ ভেঙে গিয়েছে, মার্বেলের দেবশিশুর ডানা গিয়েছে ভেঙে। ডাক্তার বোসের কবরঘেরা ক্যানাফুলের বেড়া একেবারে নিঃশেষ।

এই সর্বনাশের সবটুকু দায়িত্ব নিয়ে পার্সিও যেন ক্ষেপে উঠেছে। টক্‌টকে লাল চোখ, ভীষণ চাহনি। ঘর থেকে টুপীটা নিয়ে বেরিয়ে গেল পার্সি। বাধা দিতে সাহস হলো না আকাশীর।

তখন পার্সি যা করলো তাকে ক্ষ্যাপামি-ই বলা চলে। নিজে দু'দিন আগে গোকুলকে পাকাপাকি বহাল করা নিয়ে ঝগড়া করেছে যাদের সঙ্গে, সেই কমিটি মেম্বারদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে পূর্বসিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বললো। থানায় গিয়ে গোকুলের নামে এক লম্বা ডায়েরী করলো। পার্সির যে মাথা খারাপ হয়েছে এতদিন বাদে তাতে আর সন্দেহ রইল না কারো।

তিন দিন ধরে ঝম ঝমে বৃষ্টি নেমেছে। মাঠ জলে ডোবা। সবুজ মাঠে ঝিল্‌মিলে জল। শাদা কবরগুলির মাথা জেগে আছে। নালা বেয়ে কল কল করে বয়ে চলেছে জল।

আজ তিন দিন গোকুলের খোঁজ নেই। এদিকে সাহেবের ঘরের দোর বন্ধ। সাহেবের খাওয়া দাওয়া সেবা পরিচর্যা কোন কিছুতে আর এক্তিয়ার নেই আকাশীর। গোকুলের বেইমানি যেন তাকেও বেইমান করেছে সাহেবের কাছে। খাবারে যে বিষ দেবে না আকাশী তার বিশ্বাস কি? একজনের ভাঙা বিশ্বাস আর অন্য জনের বেইমানী। দুই জখম বুকে নিয়ে পাথর হয়ে বসে আছে আকাশী। যাবার জায়গা নেই। সরবার মন নেই। এ বড় ভীষণ শাস্তিতে তাকে ফেলেছে সংসার।

—আকাশী! আকাশী! আকাশী! সাহেবের ডাক শুনে বৃষ্টিতেই বেরিয়ে পড়লো আকাশী। দরজা খুলে ঢুকলো ঘরে।

ছন্নছাড়া ঘর। বিছানার চাদর মাটিতে লুটোচ্ছে। পড়ে আছে পার্সি। আকাশী ভয়ে ভয়ে গায়ে হাত দিলো। জ্বর হয়েছে সাহেবের। করমচার মতো লাল চোখ খুললো সাহেব। আকাশীকে ভুরু কুঁচকে দেখে ছেলেমানুষের মতো ব্যাকুল হয়ে বললো—পানি!

জল দিলো আকাশী। পার্সি আবার হাঁ করলো। গরম নিঃশ্বাস। অসুখের দুর্গন্ধ চারিদিকে। বালকের মতো রেগে উঠলো পার্সি। বললো,—তুম্ পানি কেঁও নেই দেতা? আকাশী, তুম্ ভি বেইমান।

আবার জল দিলো আকাশী। জল যেন মরুভূমিতে শুষছে। খেয়ে আবার হাঁ করলো পার্সি। বললে,—পিয়াস। পানি কেঁও নেই দেতা তুম? তারপর বললে,—তুম্‌ভি বেইমান। আমাকে একলা রেখে চলে গিয়েছিলে কেন?

আকাশী সাহেবের মাথাটা কোলে টেনে নিলো। মাথায় হাত রাখলো। পার্সি তার হাতটা চেপে ধরলো। বললো—আর চলে যেওনা। বুঝলে আকাশী।

হাঁসপাতালে গেল পার্সি জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে। ডবল নিউ-মোনিয়ায় অজ্ঞান হয়ে। চেয়ারম্যানের গাড়ীতে চড়ে। শত সাধ্য সাধনাতেও হাঁসপাতালে প্রবেশাধিকার পেল না আকাশী।

আবার ফিরলো এক সপ্তাহ বাদে। চুল আঁচড়ে নতুন পোষাক পরে, লক্ষ্মীছেলের মতো পরিষ্কার কফিনে শুয়ে। বুকে একখানা বাইবেল আর হাতে একটা গোলাপ ফুল ধরে। মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করলেন পাদ্রী। অরফানেজের ছেলেরা গান গাইলো। অনেক অশান্তি আর অস্থিরতার ঝড় খাওয়া মানুষ পার্সিভাল এই অন্তিমযাত্রার শেষ পাথেয় কি নিয়ে গেল কে জানে! এই সব প্রার্থনা স্তবগান? না মালী-বৌ আকাশীর চোখের জল? সব প্রশ্নের জবাব হয় না।

মরলো পার্সি, আর লজ্জায় মরে ঘরে ফিরলো গোকুল। মরবার আগে বেইমান মালী গোকুল মান্নার সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মরেছে পার্সি। তার চাকরীর স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে। গোকুলের আর কোন বিপদ হবে না।

আকাশীর সঙ্গে কথা হলো না। কিন্তু পার্সির এই ক্ষমার গুরুভার বুকে নিয়ে মরে যেতে লাগলো গোকুল। বেইমান মালীকে বড় শাস্তি দিয়ে গিয়েছে পার্সি। সাহেব যে কত খারাপ ছিলো তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে গোকুল। আর একবার গিয়ে যে ঝগড়া বাধিয়ে নেবে, সে উপায় নেই। আকাশীকে মাঝে রেখে আরো কোন একটা নোংরা ব্যবহার করে সাহেবকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারবে না গোকুল। সব পথ বন্ধ করে রেখে গিয়েছে সাহেব। এই কুঠিঘরের পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস, বাঁধা মাইনের নিরাপত্তায় নিশ্চিন্ত থাকুক গোকুল। নিশ্চিন্ত থাকুক আর সাহেবের এই প্রতিশোধের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে ভাল হোক।

তাই তো। বুঝলো গোকুল। মনে হলো সাহেবের সব ফন্দী সে ধরে ফেলেছে। সাহেব এমনি করে তাকে ভাল করতে চেয়েছে। গোকুল-ই কি কম চালাক? রইলো পড়ে কাজকর্ম—অল্পস্বল্প ঘাস ছাঁটে, আলতো ভাবে জল ছিটিয়ে কাজ সারে গোকুল। দূরে কোণের দিকে পার্সি সাহেবের ক্রুশবিহীন গোরটার দিকে ভুলেও তাকায় না।

আশ্চর্য হয় না আকাশী। আশ্চর্য হতো, মানুষ যদি বদলে যেতো শুধু এক সময় ভাবে, সাহেব ত' তার স্বর্গে গেলো। আকাশীকে কোন জ্বালায় জ্বলতে রেখে গেল? তার সঙ্গেও কথাবার্তা নেই গোকুলের। এক সময় মনে হয় কচুবনের দিকে সন্ধ্যেবেলা দাঁড়ায় গিয়ে। শাঁখামুঠি এসে ছোবল দিক তাকে। এই অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাক আকাশী। গোকুল মান্নার ঘর করবার দায় ঘুচুক।

গোকুল তাকে সে সুযোগও দিলো না। সন্ধ্যার আবছাতে আকাশীকে কচুবনের পথে যেতে দেখেছে সে। দেখেই সর্বনাশীর

মতলব সে বুঝলো। সায়েব বুঝি আকাশীকে এই সব ছলচাতুরী শিখিয়ে গিয়েছে? মরে জিতে যেতে চায় আকাশী? লোভ দেখিয়ে টেনে আনতে চায় শাঁখামুঠি কালাজ-কে? সাপের চেয়ে অনেক খল এই মেয়ের মন। আকাশী নিজেকে দিয়ে জানে, যে গরল বুকে বয়েই শুধু শান্তি পায় না সাপ। সে গরল ঢেলে দিয়ে নিঝুম হয়ে এলিয়ে থাকতে চায়, সে-ও সাপের-ই স্বভাব ধর্ম। কচুবনের আশে পাশে ঘন সবুজ আঁধারে ডুরে শাড়ী প'রে যদি ঘুরে বেড়ায় আকাশী —সেই ডোরা ডোরা সাদাকালো রেখাগুলির সঞ্চালন দেখে হয়তো শাঁখামুঠি মনে ভাববে এ তারই দোসর কোন নাগকন্যা হবে। মাটির সঙ্গে বুক ঘসে খুব কাছে এসে যখন সে দেখবে, না—এ ত' আকাশী! যাকে সে কতদিন দেখেছে যৌবন মুখর বুক দুটি ডুমুরগাছের ডালে ঠেকিয়ে বনডুমুর তুলতে। এই পা দুখানাও ত' তার চেনা। এদেরও ত' সে দেখেছে আকাশী যখন নিচু হয়ে কচুশাক কেটেছে। তখন শাঁকামুঠি নিঃশব্দে ছোবল দেবে আকাশীর পায়ে। মানুষের মেয়ে তার কুঁচফলের মতো নিষ্পলক সর্পচোখকে ছলনা করেছে নাগকন্যার বিভ্রম দেখিয়ে, সে খলব্যবহার ক্ষমা করবে না শাঁখামুঠি।

আকাশীকে অত সহজে ছেড়ে দেবে না গোকুল। তাই একদিন শাঁখামুঠিকে সে মেরে বসলো। গোকুল কোনদিন মারবে না জেনে তাকে কোনদিন ভয় করতো না শাঁখামুঠি। সে বিশ্বাস ভাঙলো মৃত্যুবাহী নাগের।

এখন শান্ত হবার কথা গোকুলের। তবু যেন সব মেটেনি। দু'জনের মাঝখানে সেই সব অশান্তির ঝড় জমে পাথর হয়ে আছে যতো কাছে তারা ততো বা দূর।

সকাল থেকে রাত অবধি কবরখানায় কাজ করে গোকুল। ঘাস ছাঁটছে, গাছ লাগাচ্ছে, জল দিচ্ছে। দেখে-শুনে খুবই খুশী নতুন সুপার। পার্সি সাহেবের গোর ঘিরে গোলাপের কলম লাগিয়ে দিয়ে এলো গোকুল একদিন। দুপুরের তাত বাঁচাতে চাঁচের ঝাপ দিয়ে

ঢেকে দিলো। শুধু আকাশীর সঙ্গে কোন কথা হলোনা। আকাশীর আর বাগানে কাজ করবার এক্তিয়ার নেই। নিজের ঘরের আঙিনায় সে দোপাটি রঙ্গন লাগাক না কেন, কিছু বলবে না গোকুল। তাই বলে বাগানের কাজ? গোকুল মান্নার চওড়া বুক-পিঠ, শক্ত কব্জী তবে রয়েছে কি জন্যে? পুরুষ আর মেয়ের কাজের এলাকা যেন ভাগ ক'রে দিয়েছে গোকুল।

কাছে যেতে চাইলে-ও যেতে পায় না আকাশী। সরে যায় গোকুল। কেন এখনো হলো না? না কি আরো দেরী আছে সন্ধি হবার? একদিন দেখা গেলো শাদা একখানা মার্বেলের ক্রুশ দিয়ে গেলো কারা। আকাশীর ঘরের কোণাতেই রইলো। তা নিয়েও কোন কথা হলো না। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ কুঁচকে কি দেখে গোকুল। আকাশী তা জানে না।

শুক্লপক্ষের রাত এলো। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে আকাশী দেখে বিছানায় নেই গোকুল। বেরিয়ে এলো আকাশী।

ধবধবে চাঁদের আলো। আকাশ মাটি এক করে ফেলেছে। ঠাওর করলে কবরের লেখা পড়া যায়।

কতদিন এদিকে হাঁটেনা আকাশী। তবু খোঁজ করে ঠিক এলো। পার্সি সাহেবের কবরের মাথার কাছে শাদা মার্বেলের ক্রুশটা চকচক করছে। ফুটন্ত গোলাপের গন্ধ বাতাসে ছড়াচ্ছে। পাম্পে করে ঝিরঝির জল দিচ্ছে গোকুল।

কাঁধে হাত দিলো আকাশী। ফিরে তাকাল গোকুল। দুজনের মাঝখানের ফাঁকটুকু যেন জলে ভেজা। পার্সি সায়েবের বেইমান মালী গোকুল মান্না, না সে নিজে, কার চোখে যে জল বইছে ঠাওর করতে পারেনা আকাশী। গোকুল বলে, জল দিইনা বলে বড় কথা শোনাচ্ছে সাহেব ক-দিন ধরে। রোজ বলবে, পানি কেঁও নেই দেতা। চাঁদ না উঠলে নজর চলেনা তা বোঝেনা।

কথা কয় না আকাশী। আকাশী কাঁদে আর গোকুল হাসে।

তুই কত জল খাওয়ালি। তবু ছাখ, কি তেষ্টাটা ছিলো সাহেবের। আমি এসে জল দিলাম তবে শান্তি হলো।

মাথা নাড়ে আকাশী। এতদিন যে প্রশ্ন গোকুলের বুকটা কুরে খাচ্ছিলো সেই প্রশ্নই মুখ দিয়ে বেরোয় অসহায় মিনতির সুরে। মুখ নামিয়ে ফিসফিসে গলায় গোকুল বলে, সাহেব নিশ্চয় জানছে যে গোকুল মান্না বেইমান নয়। না কি, বল ?

এ জবাব চায়, ও আশ্বস্ত করতে চায়। চোখে চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট বোঝে আকাশী যে মাঝের দেওয়ালখানা ভেঙে চুরে গেল।

ছেলেটির উৎসাহে প্রোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে সস্নেহে হাসলেন তিনি। বললেন—কাল সকালেই যাব। তুমি আর আমি।

—শুধু আমরা দু-জন? আর কেউ থাকবে না?

—তুমি কি চাও, আরো কেউ থাকুক?

—আপনি পথ চেনেন?

—এক সময় এমনি ধারা বনে জঙ্গলে-ই দিন-রাত কেটেছে আমার। চাটগাঁর হিল-ট্র্যাক্টস। বিষ্টিতে ভেসে আসছে সাপ, জোঁক, ম্যালেরিয়া। পেছনে পুলিশ। তখন কিন্তু বিপদের ভয় করিনি।

এই বিখ্যাত মানুষটির মুখের কথা শুনতে শুনতে শ্রদ্ধায় বিগলিত হলো তরুণ ছেলেটির হৃদয়। বললো—আজ তা'হলে বিশ্রাম করি। কেমন?

ছেলেটি শুতে গেল পাশের ঘরে। তিনি শুনতে পেলেন সে গান করছে।

তার গুন্‌গুন্‌ শুনতে শুনতে তিনি ঘুমের ওষুধ খেলেন। এমনি গান গলায় আসে কখন? যখন মানুষ তরুণ থাকে। তারুণ্যের আত্ম-বিশ্বাস-ই এই গানের উৎস।

চাকর মাসাজ করে গিয়েছে। সিল্কের পাজামা পরে পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি। সম্মানিত অতিথি। সমাদর-ও তাই রাজসমারোহে। কোনও ত্রুটি রাখেননি চা-বাগানের মালিকটি। তবুও ঘুম আসতে দেরী হলো।

ঘুম বড় মূল্যবান তাঁর কাছে। এবং দেশবাসীর কাছে-ও।

কাল দুপুরে যাবেন গ্রাম-মণ্ডলীর গ্রন্থাগার উদ্বোধন করতে।

বিকেল তিনটের প্লেন ধরবেন। তারপর তিনঘণ্টা বাদে-ই পৌঁছবেন কলকাতা। ছটায় পৌঁছিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে স্নান করে তৈরী হয়ে নিতে হবে। রাত আটটায় হোটেলে বিদেশী অতিথিদের সম্বর্ধনা সভা।

রাত দশটায়? শর্মিলা তালুকদারের ঝকঝকে হাসিটা মনে পড়লো। শর্মিলার সঙ্গে তাল দিতে দিতে রাত এগারোটা বাজবে। তাঁকে ভর করে সাংস্কৃতিক জগতে পা বাড়াবার ইচ্ছে হয়েছে শর্মিলার। দুটি ছেলে দেরাদুনে পড়ে। স্বামী গিয়েছেন ফ্রান্সে। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে। তাঁর চেহারা দেখে, তাঁর সুন্দর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে শর্মিলা তালুকদার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

তবু তাঁর ঘুম এলো না। তাঁর ঘুম চুরি করেছে ঐ তরুণ আদর্শ-বাদী ছেলেটি।

নিজেকে তিনি তরুণদের দলেই ফেলেছেন। তাই ছেলেটি যখন দেখা করতে এলো, আশ্চর্য হননি। না হয় সোনামুড়া থেকেই আসছে। তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করবার জন্যে, বা কথা কইবার জন্যে কলকাতায়ই কি মানুষ কম কষ্ট করে?

—ব্যক্তিপূজার দিন বিগত।—এ কথা বলে তিনি নিজেও কতবার বক্তৃতা দিয়েছেন। তবু, তিনি নিজের বিষয়ে ব্যক্তিপূজার উৎসাহী সমর্থক। সচেতন মনে ব্যাপারটাকে স্বীকার করতে বেধেছে। ওরা আসে, ওরা উৎসাহ চায়, ওরা শ্রদ্ধা করতে চায়—এই সব বলেছেন আশপাশের মানুষকে। প্রথমে মনে বিঁধতো। মনে হতো প্রবঞ্চনা করছি। নিজেকে এবং পরকে। মনে হতো সারাজীবন যে সব কথা বলেছেন, যে সব আদর্শ প্রচার করেছেন। আজ তার বিরোধিতা করছেন। আজ আর বাধে না। ক্রমে ক্রমে কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে শিখেছেন।

ছেলেটি কিন্তু এলো সম্পূর্ণ অন্য বক্তব্য নিয়ে। বললো—কথা আছে আপনার সঙ্গে। অনেক প্রশ্নের জবাব চাই।

—রিপোর্টার? এখানে-ও?

—প্রতিনিধি বলতে পারেন।

—কাদের?

—অনেক মানুষের। যারা আপনাকে বিশ্বাস করেছে, সমর্থন করেছে,—আর আজকে যাদের আপনি বিভ্রান্ত করেছেন।

এ ধরনের কথা শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন। দীর্ঘছন্দ দেহটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে, কপালের রুক্ষচুলটি সরিয়ে তিনি মোটা কাচের চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ নজর করলেন। কে হতে পারে? কি নাম?

চা-বাগানের মালিক ভদ্রলোকটি বললেন,—কে তোমাকে আসতে দিলো? আবার এসেছো তুমি?

তাঁর কথায় মনে হলো ছেলেটি তাঁর খুব চেনা। একে তিনি জানেন।

—ওঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে আমার।

—উনি সামান্য বিশ্রামের জন্য এসেছেন।—তোমার এই সব আবোল-তাবোল বকুনি শুনে এই সময়টুকু নষ্ট করবেন কেন? তোমরা বড় অবুঝ। একটু শান্তির যে ওঁর কত প্রয়োজন!

তিনি হাসলেন। বললেন—

—কি নাম ভাই তোমার?

—অমলচন্দ্র বসু।

সাধারণ নাম। সাধারণ ছেলে। তিনি জানেন এদের সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয়, কি ভাবে মেলামেশা করতে হয়। অন্যান্য নেতারা এইসব সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে, এদের মুখোমুখি হতে ভয় পান। তিনি কোনদিন-ও ভয় পান না।

তিনি আবার সুন্দর হাসলেন। বললেন—

—সান্যাল মশাই, আপনি ঘুরে আসুন। আমি আলাপ করি অমলের সঙ্গে।

ঘাড় ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন সান্যাল। তাঁর চা-বাগানে

গোলমাল হয়েছে। কমিশন আসছে তদন্ত করতে। তাঁদের আনতে এয়ারোড্রামে যেতে হবে। বলে গেলেন,

—পুরোদিনটা রইলো আপনার। বিশ্রাম করবেন কিন্তু। কাল আপনার অনেক কাজ।

বাংলো ছেড়ে বাগানে নেমে এলেন তিনি।

ঝাউগাছের নিচে বেতের চেয়ার ছড়ানো। কাচের চৌবাচ্চায় অনেকগুলো মাছ খেলা করছে না! বড় মাছটা বোধ হয় ছোটগুলোকে তাড়া করছে। মালীটা খাবার পোকা ছড়াচ্ছে। লাল, সোনালী, কালো-মিশমিশে পাৎলা ডানাওয়ালা মাছ। দেখে দেখে কে বলবে ওদের মধ্যে চলেছে অদ্ভুত একটা মারণনীতি। ছোট মাছগুলো প্রাণভয়ে ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর দর্শকজনের মনে হচ্ছে বড় সুন্দর লীলায়িত এই সফরীখেলা।

কাচের বেড়া টপকে চলে এসেছে বড় মাছটা। তার রাক্ষুসে হাঁ-টা দেখেও নির্দোষ এক গতিছন্দ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

এই যে পরস্পরকে সংহার করে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে জীবজগৎ, এ সম্পর্কে ছেলেটিকে কিছু বলতে চাইলেন তিনি। এখানে-ই তাঁর বৈশিষ্ট। এমনি সব ছোট ছোট জিনিষ নিয়ে এমন সুন্দর কথা কইতে পারেন! সে কথা শুনতে-ই বা কতো লোকের আগ্রহ।

কিন্তু ছেলেটি তো শুনতে চায় না। বলতে চায়। নিশ্বাস ফেলে সিগারেট হাতে বেতের চেয়ারে ডুবে গেলেন তিনি। ছেলেটি কথা কইতে সুরু করলো। অনেকদিনের বক্তব্য জমেছিলো বোধ হয়। সুন্দর সুন্দর সাজানো মন রাখা কথা নয়। আবেগে জড়িয়ে গেল গলা। উৎসাহে কেঁপে উঠলো কখনো। আন্তরিকতায় উত্তপ্ত কথাগুলি তাঁর মনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। শুনতে শুনতে মনে হলো তাঁর মনের অনেক ভিতরে সে-ই যে একজন ঘুমিয়েছিলো, সে-ই জেগে উঠেছে।

সে কি তিনি? সেই মানুষটার টাকাপয়সা ছিলো না। ছিল নিষ্ঠা, প্রেম, আবেগ। দীপ্ত আদর্শবাদের বাণী হৃদয়ে বহন করে সেই মানুষটি কতো দুর্গম ও বন্ধুর পথে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে। কারাবরণ করেছে। দশজনের দুঃখ ভাগ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে সংগ্রামের পথে। সেই মানুষ এমনই লম্বা ছিলো। এমনিই রোগা আর ফর্সা। আধময়লা জামাকাপড় পরে সে ফুটপাথ আর বেঞ্চিতে শুয়েও কাটিয়েছে কতো রাত। সে কি তিনি? ছেলেটি বলে চললো,

—আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছি। ভালোবেসেছি, আপনি ছিলেন দল আর গোষ্ঠীর বাইরে। স্বার্থ-চিন্তাকে আপনি ঘেন্না করতেন। হুজুরীমল লেনের বাসায় যখন আপনি আর শঙ্কর দত্ত ছিলেন—শঙ্করের টি-বি হলো···সেই যে কাগজে লিখলেন··· লেখক নন, তবু প্রয়োজনে ত' চিরকালই আপনি কলম ধরেছেন···

সব কথা তাঁর কানে যায় না। উনিশ-শো ত্রিশ না একত্রিশ সে-টা শঙ্কর···শঙ্কর···শঙ্কর! সেই মেয়েটির কি হলো? শঙ্করের যাকে বিয়ে করবার কথা ছিলো? বীণা। শঙ্কর-কে যে দেখতে আসতো হাসপাতালে? শঙ্কর! মরলো বলতে গেলে বিনা-চিকিৎসায়। চল্লিশ টাকা। চল্লিশটা টাকা সেদিন তাঁর কাছে ছিলো স্বপ্ন। বড় সুন্দর দেখতে ছিলো বীণা। আর মস্ত প্রতিভা ছিলো শঙ্করের। মেধাবী ছাত্র ছিলো! একটি সুন্দর মেয়ের প্রেম আর বন্ধুবান্ধবদের সেবা, কিছুতেই বাঁচানো গেল না শঙ্করকে। তারপরে বীণা তাঁর কাছে কতবার এসেছে। শেষ অবধি বীণা-ও যে কোথায় হারিয়ে গেল—অনেক মানুষের ভীড়ে—অনেক জীবন সংগ্রামের মোহনায়। আর তার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

আজ তাঁর কাছে চল্লিশ টাকার কোন দাম-ই নেই। সেদিন-ই চল্লিশ টাকার ফুল কিনে শর্মিলাকে দিলেন।, অথচ একদিন চল্লিশ

টাকা পেলে শঙ্কর নামে একটি ভালো ছেলেকে বাঁচানো যেত। বীণা নামে একটি সুন্দর মেয়ের স্বপ্ন সার্থক হতো।

অমলের কথা শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয় বুকে যেন আবার ধাক্কা লাগলো। শঙ্করের নাম মনে পড়তে তাঁর কেন মন খারাপ হলো? তাঁর হলো, না পঁচিশ বছর আগেকার সেই মানুষটির হলো মন খারাপ? না কি তিনি আর সে একই মানুষ?

অমল বলে······এমন করে আপনাকে বলবার কোন মানে না কি হয় না। ওরা বলে আমি নাকি পাগল। মাথায় আমার ছিট আছে হয়তো আছে। বুঝি না। তবু মনে হয়, একটা মানুষ, যে ছিলো আমাদের মুখপাত্র, যাকে আমরা বিশ্বাস করতাম, তাকে কিছুতেই হারাতে পারবো না। আপনি-ও এর-ওর-তার মতো স্বার্থ ছাড়া কিছু ভাববেন না—নীতির বালাই রাখবেন না—সুবিধে মতো দল বদলাবেন —তা কিছুতেই হতে পারবে না। টাকা···অনেক টাকা ত' করেছেন ···বলুন টাকাই কি সব?

মোটা কাচটা মুছে নিয়ে তাকান তিনি। ঘাড় নেড়ে জানান, না। টাকা সব নয়। অমল এগিয়ে আসে। বলে,

—আমাকে ওরা বলে পাগল। আপনাকে এ সব কথা এমন-ভাবে বলবার কোন মানেই হয় না। সত্যিই কি আমি পাগল? আমার মনে হয়, আপনি যে ভুল করেছেন তা যেন আপনি নিজেও জানেন না। জানলে কি ভুল করতেন?

উস্কোখুস্কো চুল। ঘাম চিক্‌চিক্ করছে মুখে। অমল বলে

—চারিদিকে শুধু বিশ্বাসঘাতকতা। এ ওকে ঠকাচ্ছে···ও তাকে ঠকাচ্ছে···দেখে দেখে যে কি রকম লাগে। মনে হয় অন্যায়ের সঙ্গে এত আপোষ করে মানুষ বাঁচে কি করে?···

এখন, এই রাত দুটোয়, সিল্ক নেটের মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে ছেলেটির কথা মনে করতে করতে সামান্য ঘুম নামলো চোখের পাতায়। ওষুধের নেশায় চোখ বুঁজে আসছে। তবু মনটা কি

ঘুমোচ্ছে? না তো। মনে যেন ভয়। কাকে ভয়? ঐ ছেলেটিকে। একটা আধাক্ষ্যাপা ছেলেকে? হ্যাঁ তাকেই। কেন? কেন না তাঁকে দেখে যারা বিভ্রান্ত হয়, ও তাদের দলে নয়। ওর চোখে তিনি নিজের পরাজয় দেখতে পাচ্ছেন। এমনি অনেক মানুষ তাঁকে অবিশ্বাস করে। অশ্রদ্ধা করে। লোকের শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসই তাঁর পুঁজি। সেখানেই যখন ফাঁকি ঢুকলো তখন তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি অবহিত হতে হবে। সেই ছেলেটার মুখ কি রকম যেন? তাঁর পঁচিশ বছর আগেকার চেহারাটার মতো। সেই মানুষটা তাঁর মন ছেড়ে যেন বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে একটা বেতের চেয়ারে বসেছে। বসে তাঁকে কি বলছে। সেই ছেলেটার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বলছে···বাঁচবার উপায় হলো মাথাঝাড়া দিয়ে ওঠা-মেরুদণ্ড তুলে দাঁড়ানো। চোরা কণ্ট্রাক্ট-গুলোর লোভ ত্যাগ করা। একটা অকৃতদার মানুষের পক্ষে যা দরকার তার অনেক বেশী তুমি পেয়েছো। শেষ ক'টা দিন সুন্দরভাবে বাঁচতে চেষ্টা করো। সমুদ্রের ধারে চলে যাও। পাহাড়ে যাও। দেশে দেশে ঘোর। যা হয় করো।

সেই কথাগুলো তিনি শুনছেন কি? না তো। শুনতে শুনতে তাঁর চোখ চলে যাচ্ছে সেই মাছটার দিকে। যে কাচের দেয়াল পেরিয়ে ছোট মাছগুলোকে গিলে চলেছে। সুন্দর ও শোভনভাবে একটা হিংস্র কাজ করছে।

একটা ভয়াল মাছের মতোই হাঁ করে অশান্ত অন্ধকার এসে তাঁকে গ্রাস করলো। ঘুমোলেন তিনি। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও অস্বস্তির অনেক কাঁটা বিঁধতে লাগলো তাঁকে। এই নিরবয়ব আঁধারটার মুখের মধ্যে যেন ঘুমোচ্ছেন তিনি, আর গায়ে বিঁধছে তারই অদৃশ্য সব দাঁত।

সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। ঘন সবুজ গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুঁড়ি পথ ধরে তাঁরা দুজন চলেছেন। অনেক কথা হয়েছে। অমলের

মন এখন খুব প্রসন্ন। তার কাছে কথা দিয়েছেন তিনি। আর এমন ক'রে আলেয়ার পেছনে ছুটবেন না। ফিরে আসবেন। আগের মতো হবেন। কেমন করে যে হবেন, কোথা থেকে যে সুরু করবেন, সে সব কথা হয়নি। হয়েছে শুধু হৃদয়ের কথা। সেখানে আবেগটাই বড়ো। সত্য ভাষণই আসল কথা। অমলের মনে হচ্ছে মনটা তার হালকা হয়ে গেল। শেষ অবধি যে তার শুভবুদ্ধির জয় হলো, সে জন্য নিজের ওপর বিশ্বাস তার ফিরে এসেছে।

তাঁকে খুব চিন্তাকুল দেখাচ্ছে। বুড়িয়ে গিয়েছেন যেন। এ সব পথ নেহাত খুব জানা তাই এগিয়ে চলেছেন নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে।

ছেলেটি বলে—আর কতদূর?

জবাব দেন না তিনি। পিপাসার সময়ে বন্যজন্তু যেমন জলের গন্ধ ঠাহর করে করে এক লক্ষ্যে চলে, তেমনই এগোচ্ছেন তিনি, যা খুঁজছেন, এখনো পাচ্ছেন না। আর কত দূর? না কি পঁচিশ বছরের ব্যবধানে সব-ই বদলে গেল?

না। পাওয়া গেছে নদীটা। আজ সারা সকাল শুধু তাঁর যৌবনের দিনগুলির গল্প করেছেন অমলের সঙ্গে। সেই দিনগুলির সঙ্গে নদীর এই জায়গাটুকুর অনেক স্মৃতিই জড়ানো। এখন আবার সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নিশ্বাস নিলেন বুক ভরে।

ছোট নদী। এখানে এসে পাথরে পাথরে পাক খেয়ে ঢালুর দিকে নামছে গমগম শব্দ করে। নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে জাম-গাছের ডালপালা। অমলের চোখে হয়তো একান্ত পরিচিত এ দৃশ্য। তবু আজকে আবার নূতন করে সে মুগ্ধ হলো। তিনি যখন মুগ্ধ হচ্ছেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অমল আবার দেখলো। সেও বললে—চমৎকার!

এখন প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তাঁকে মেপে মেপে ফেলতে হবে। জলে নামলেন তিনি। অল্প জল। দুরন্ত স্রোত। জামগাছটার ডালটা হাতে ধরে অমলকে বললেন—ওপারে যাই চলো।—বলতে না বলতে

তাঁর পা পিছলে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ আর মুখের ভয়ার্ত ছবি দেখে আর কিছু ভাবলো না অমল। সেও লাফিয়ে নামলো জলে। আর এই শ্যাওলা পেছল পাথরে লাফিয়ে নামাই বেয়াকুবি। সেই ভুলই করলো অমল। চীৎকার করবার সময় হলো না। বে-কায়দায় পা পিছলে জলের সঙ্গে পাকাতে পাকাতে সে গিয়ে পড়লো একেবারে সাত ফিট নীচে আর ওরকম জায়গায় সাত ফিট উচ্চতাটা-ও মারাত্মক।

জলের চোরা পাকের গ্রাসে পড়ে, পাথরের ফাঁকে অমলের শরীরটা যখন স্থির হয়ে গেল, তলিয়ে গেল, তখন তিনি জামগাছের ডালটা ধরলেন। ওপর দিকে চেয়ে আকাশ দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন সবুজ পাতাগুলো। আর মনে হলো, আজকের এ ঘটনার সাক্ষী রইলো একমাত্র এই গাছপালাগুলো। আর কেউ নয়, আর কিছু নয়। কি ভাগ্য, যে গাছপালা কথা কয় না।

কিন্তু তাঁকে ত' বাঁচতে হবে। আর সমস্ত ব্যাপারটার পরি-সমাপ্তি-ও নিখুঁত অভিনয়ে সম্পূর্ণ করতে হবে।

জামগাছের ডাল ধরে কোন মতে ওপরে এসে ঘাসের ওপর পড়ে গেলেন তিনি। সাঁতার জানে না, তবু যে অমল লাফাবেই তাকে বাঁচাতে, তা তিনি জানতেন এবং তাই জেনেই চেঁচিয়েছিলেন। তবু ঘামতে লাগলেন দরদর করে। ভেজা গা দিয়েই ঘাম বেরুতে লাগলো। তারপর উঠে ছুটতে সুরু করলেন। গাড়ী ছিলো অনতিদূরে। ড্রাইভার ছিলো, টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে চাকর ছিলো। তারা ছুটে এলো। আরো আরো মানুষ এলো। তোলপাড় হলো জল। পাথরের আঘাতের চেয়ে অনেক মারাত্মক জলের একটা চোরা পাক।

অমলকে যখন তোলা হলো, তখন তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—ও আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল, আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। এ কি করলাম? আমি ওকে হত্যা করলাম?

তাড়াতাড়ি সান্যালমশাই-এর কাছে খবর গেল। সমবেত মানুষগুলি নিজেদের মধ্যেই চাপা গলায় প্রশ্নের গুণ্ গুণ্ তুললো।

—এ অঞ্চলে ও চোরাপাক বিখ্যাত। তবু ছেলেটি নামলো কেন।

—ওঁকে বাঁচাবে বলে।

—পাগল না বোকা ?

—চিরকালই ক্ষ্যাপাটে।

তিনি এত ভেঙে পড়লেন যে তাকে সামলাতে সান্যালমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তবু তাঁকে আশ্বস্ত করা গেল না। কোথায় কে আছে ছেলেটির ? আত্মীয়স্বজন ? তাদের সাহায্যের জন্য মুঠো মুঠো টাকা দিলেন বের করে। যা হয় কিছু একটা করা হোক। একটা সিমেণ্টের ফলক। একটা কিছু।

অমলের মৃত্যুর দুই ঘণ্টার মধ্যেই এ সব ব্যবস্থার কথা শুনতেও খারাপ লাগলো ডাক্তারের। তবু তিনি এঁর মহানুভবতায় অভিভূত হলেন। যিনি সন্ধ্যার আগে কলকাতা চলে যাবেন—তাঁর এ-রকম দূরদর্শিতা, সহৃদয়তা, মনে হলো এর যেন তুলনা নেই। দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে একটি সামান্য ছেলে, তার জন্যে তিনি কি রকম অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আবার মনে হলো, এই সব গুণের জন্যেই তো তিনি বিখ্যাত ! একটি মানুষের মধ্যে এতখানি মহত্ব—কেমন করে যে সম্ভব হয় ! অমলের জন্যে তাঁর শোকই বা কি গভীর ! সাধারণ ছেলে অমল, তাঁর মুখের টুকরো টুকরো কথায় হয়ে উঠলো অসামান্য ! তার সম্পর্কে তিনি এমন আন্তরিক আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন ! এই সাধারণ ছেলেটির মধ্যে যে কি অসাধারণ হৃদয়-সম্পদ ছিল, কেউ তা জানেনি। কেউ তা বোঝেনি।

শুনতে শুনতে সান্যালমশাই গলা ঝেড়ে বললেন—আমি ওর নামে শাদা পাথরের একটা স্মৃতিফলক করিয়ে দেবে। দেখবেন।

—সত্যি ?

বলে তিনি আবার অভিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন,

—আজ ঐ ছেলেটির এই পরকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনটাকে তুচ্ছ করা দেখে আমার মনে হচ্ছে ওর কাছে আমি কত ছোট, কত তুচ্ছ, সত্যি, ওরাই হলো খাঁটি ইস্পাত। ওরা-ই যুগে যুগে ইতিহাস রচনা করে। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

আজ সকলেরই মনে হলো ঐ ছেলেটি কি অসামান্য!

আর সামান্যকে অসামান্য করলেন যিনি, সেই তাঁর দিকে চেয়ে অভিভূত ডাক্তার দুদিকেই মাথা নাড়লেন।

অমল নেই। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর তাঁর কোন ভয় নেই। এবার আর কেউ এসে তাকে অস্থির করে তুলবে না। এখন তিনি আবার আগেকার মতোই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চলেফিরে বেড়াতে পারবেন।

কলকাতায় কদিন বাদে এক ঝলমলে রাতে শর্মিলা তালুকদারের ছাদের ঘরে উঠতে উঠতে খুব ভালো লাগলো তাঁর। ঘুমের কষ্টটা একেবারেই নেই। বেয়াড়া সব প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলেছিলো অমল। তাই ঘুম হতো না। বেচারা! দারিদ্র্য আর আদর্শবাদের ভুতে মানুষকে যে কি করে ফেলে! শর্মিলাকে সেই কথাই বললেন।

শর্মিলা আজ কি রকম সেজেছে! হলদে কালো পোষাক, কটা চুলে উদ্ধত খোঁপা। বাঘিনীর মতো।

ঘরে বসে শর্মিলা তালুকদার মাথা হেলিয়ে রাখলো সোফায়। বললো—এবার সেই হতভাগ্য ছেলেটির কথা বলো?

—ব্যক্তিপূজার কেস আর কি!

—বলো! তোমার অপূর্ব ভাষায় বলো! জানো তোমার জন্যে আমি নতুন করে বাংলা শিখছি!

—বলছি!

বলে থামলেন তিনি। সামনের জানালায় একটা ক্যাকটাস। ঘনসবুজ। আঁকাবাঁকা। সতেজ। মুগ্ধ ও ঈষৎ ভয়ার্তভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন,

—ঐ কুৎসিত জিনিষটা সরাও?

বেয়ারা সরিয়ে নিলো টবটা। এবার মুখ নিচু করে খোঁপা ঠিক করলো শর্মিলা। তিনি বললেন,—

—কি বলছিলাম?

—কি বলছিলে?

মানুষের মন জটিল। দুর্গম অরণ্যের মতোই দুর্ভেদ্য তার প্রবেশপথ। ঐ গাছটা দেখে ক্ষণিকের জন্য তাঁর বিভ্রম হয়েছিল। মনে হয়েছিলো বুঝি বা গাছটা করণ্যের সাক্ষী, আর তাঁর মিথ্যাভাষণ সে ধরে ফেললো।

সে আত্মবিভ্রম-কে তিরস্কার করলেন তিনি। স্পন্দিত হৃদয়কে শাসন করলেন। বললেন,

—বলছি। সেই দুর্ঘটনার কথা।

সত্যিটুকু ঢেকে সুন্দর ভাষায়, অননুকরণীয় ভঙ্গীতে চমৎকার করে তিনি বলতে সুরু করলেন।

শুনতে শুনতে শর্মিলা কাছে এলেন। শর্মিলার উদ্ধত বুকের লোভনীয় হাতছানি দেখতে দেখতে তাঁর গল্প বলা-টা আরো সুন্দর হয়ে উঠল। তাঁর অসমান দাঁতের সারিতে হাসি ঝিলিক দিতে লাগল।

সে গল্পে অমল রইল না, তিনি রইলেন না—রইলো শুধু সাজানো কেয়ারি করা ফুলের বাগানের মতো, গোছা গোছা কথার ফুলঝুরি। আবেগে রঙীন, উত্তাপে মোহনীয়।

প্রতিভার অন্ধভক্ত একটি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হতভাগ্য তরুণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা তাঁর মুখে হয়ে দাঁড়ালো চমৎকার একটা গল্প। সে গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে শর্মিলা আরো কাছে এলেন। বললেন,

—বলো, আরও বলো ...

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তিনি, আর শর্মিলা শুনতে লাগলো তাঁর কথা। এ ঘর নিরাপদ। এখানে কোনও ভয় নেই। এখানে সেই দিনটার কোন-ও সাক্ষী নেই—আকাশ, বাতাস, অরণ্য, ও নদী—সব কিছুর উদারতা এ ঘর থেকে নির্বাসিত। এ ঘর মানুষের সৃষ্ট এক কৃত্রিম অরণ্য—এখানে মানুষ সত্য পোষাক পরে বসে জানোয়ারের হৃদয় বুদ্ধি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে লোভ ও কামনার সংঘাতে মাতে।

এই নিরাপদ পরিবেশে নিজের গল্পটা নিজেই বিশ্বাস করতে সুরু করলেন তিনি। তাঁর চমৎকার গল্পটি সত্যি হয়ে উঠতে লাগলো আর এতদিনে যেন সত্যি সত্যি মরল অমল।

বেলা নেই। বেলা আত্মহত্যা করেছে।

বড় ভীরু, বড় লাজুক মেয়ে ছিল বেলা। তার জন্মের বহু আগে থেকেই তাকে জানতেন কিরণবাবু। তাকে জানতেন মানে, তার বাবাকে জানতেন। বেলার বাবা ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী, বাল্যবন্ধু। একই ইস্কুলে দুজনে পড়েছেন। একই মফঃস্বল শহরে বড় হয়েছেন। অমিয়বাবু এখানেই কালেক্টরিতে কাজ করেছেন, আর কিরণবাবু প্র্যাকটিস করেছেন এই আদালতেই।

স্বভাব-চরিত্রে অবশ্য বহু ব্যবধান ছিল। অমিয়বাবুকে সকলে জানতো রুক্ষ, কৃপণ ও সন্দিগ্ধ স্বভাবের মানুষ বলে। শুধু কি অমিয়বাবু—তাঁর বাবা, তাঁর ভাইরা সকলেই একছাঁচের মানুষ। এমন মানুষকে ভালো লাগা সম্ভব নয়।

কিরণবাবুর স্বভাব তার বিপরীত। এই মফস্বল শহরে তাঁর বাবার যে সুনাম ছিলো মহৎ ও জনপ্রিয় একটি মানুষ হিসাবে—দয়া, দাক্ষিণ্য ও ঔদার্যে—কিরণবাবু সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

ঠিক যে সর্বদা তিনি দানধ্যান করেছেন বা পরোপকার করেছেন, তা নয়। সত্যি বলতে কি, সে আর্থিক সঙ্গতি-ই তাঁর নেই। তবু পুরনো জুতোর ভেতরে পা গলিয়ে যেমন আরাম বোধ করে মানুষ, কিরণবাবু তাঁর বাবার সেই সুনামটির খোলশের ভেতরে তেমনই আরামে ঢুকে পড়েছেন।

সকলেই তাঁকে সভা-সমিতিতে ডাকে। শহরে নূতন কিছু করতে হলে ছেলেরা তাঁরই কাছে আসে। আবার শহরে মন্ত্রী এলে, সম্মানিত নাগরিক হিসাবে তাঁরই আমন্ত্রণ হয় ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি মধ্যাহ্নভোজনে।

সেই কিরণবাবু আজ মৃত অমিয়বাবুর মেয়ে বেলার আত্মহত্যায় বিমূঢ় হয়ে বসে আছেন। ধ্বসে গিয়েছেন তিনি। সমস্ত জীবনের হিসেবটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

অমিয়বাবুর বিয়েতে তিনি গিয়েছিলেন নেহাতই প্রতিবেশী হিসেবে। বেলার মা বৌ হয়ে এলেন যখন, অন্যান্য পাড়াপড়শীর মতো চারটি রুপোর টাকা ধরে দিয়ে মুখ দেখে চলে এসেছিলেন।

কিরণবাবুর আজকের মন-খারাপের মূলে কোনো পূর্বস্মৃতি নেই। বেলার মাকে তিনি তেমন জানতেন না। অমিয়বাবুর প্রতিও তাঁর বন্ধুত্বের বিশেষ কোনো আনুগত্য ছিলো না। বেলার বাবা আর মাকে জানতেন তিনি। তাই বলা চলে বেলাকেও জানতেন। সেই বাবা আর মা'র মেয়ে বেলা। তার সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব তাঁর তো ছিলো না। তবু কেন এমন হলো ?

কাল বিকেলেও এসেছিলো বেলা। কিরণবাবু চেয়ে দেখেন। বারান্দায় ঐ-যে মোড়া, ওখানেই এসে বসেছিলো। তাঁকে কি বলেছিলো ? এখন কিরণবাবুর মনে পড়ে, বেলার চুল ছিলো রুক্ষ। ফরসা, সরু গলা জড়িয়ে আঁচলটা জড়াচ্ছিলো খুলছিলো বেলা। মাটির দিকে চেয়ে-চেয়ে বলেছিলো,—কাকাবাবু, আমি আপনার পায়ে পড়ি, আপনার বাড়িতে আমাকে শুতে দিন এই রাতটা। বড় ভয় করে আমার। রাত হলে আমি একলা থাকতে পারিনা। কিরকম যে লাগে। কাকাবাবু!...

কিরণবাবু শুনেছিলেন কি ? না তো। তিনি গম্ভীর ও সংযত, বিবেচক গলায় মেপে মেপে বলেছিলেন,—তা সম্ভব নয়। এরকম অসম্ভব অসঙ্গত প্রস্তাব তুমি করোনা। ভয় কি তোমার ? ডাকলেই তো আমার বাড়ি থেকে সাড়া পাবে। তোমার কাকীমা, বৌদি বা মেয়েরা কেউ নেই। কেমন ক'রে এখানে শুতে পার তুমি ?

—কেন কাকাবাবু ?

—তা হয়না।

তাঁর চোখের দিকে চেয়ে বেলা বোধহয় বুঝেছিলো যে কতখানি অসঙ্গত তার প্রস্তাব। তখন তাঁর চোখে পড়েছিলো বেলার পরণে একখানা বেনারসী। দেখে তাঁর খুব খারাপ লেগেছিলো। মনে পড়েছিলো এইসব অদ্ভুত পোষাক নিয়ে কত কথা বলে গিয়েছে কতজন। বিরক্ত-ও হয়েছিলেন তিনি। সাতাশ বছরের একটা অবিবাহিত মেয়ে এমনধারা বেনারসী প'রে ঘোরে কেন ভেবে পাননি তিনি।

বেলা তারপর পায়ে পায়ে শাড়ী জড়িয়ে চলে গিয়েছিলো বাড়ি।

তারপর আর কেউ তাকে দেখেনি।

রাত বারোটা বাজলে পরে যখন আমগাছটার ছায়া এসে ঝুঁকে পড়েছিলো বেলার ঘরের সামনে—আর চাঁদের আলোয় ঘরের ভেতরে নানারকম বিভ্রম সৃষ্টি করেছিলো—তখন বেলা উঠেছিল। কড়িকাঠের আংটাটার দিকে গোলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলো শাড়িখানা। তারপর ভারী মার্বেলের টেবিলখানা টেনে এনেছিলো। বেলার শরীরে তেমন জোর ছিলো না। তবু তার সরু পা দুখানা দিয়ে সেই মার্বেলের টেবিলখানা কেমন করে যে সে ছুঁড়ে ফেলতে পেরেছিল—ভেবে ভেবে আজ সকালে তরুণ ইন্‌স্পেক্টরটি আশ্চর্য হলেন।

আজ সকালে কিরণবাবু তাঁর কর্তব্য করেছেন। গিয়েছেন। পুলিশকে যা বলবার তা বলেছেন। পরের ব্যবস্থাও করেছেন। শেষ অবধি এমনিভাবে করেছেন সব-কিছু, যে প্রশংসা করেছে সকলেই। সে-প্রশংসা তাঁর কানেও এসেছে। যেমন

—কিরণবাবু ছিলেন ব'লেই···

—ওঁর মতো মনপ্রাণ দেখা যায় না···

—এঁরাই হলেন সত্যি মহৎ লোক···

শেষের ক্লান্তিকর রূঢ় অধ্যায়টা বোধহয় শেষ হয়ে এলো কোতোয়ালীর ঘাটে। বিবেকানন্দ ব্যায়াম-সমিতির ছেলেরা তাঁকে

থাকতে দেয়নি। জোর ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়ি। বলেছে,—স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান। আমরা স—ব ঠিকমতো সামলে দেব।

চলে আসবার আগেই কিরণবাবু আরো সব কথা বলেছেন সর্দার ছেলেটিকে। যেমন—সমিতির ছেলেরা শ্মশান থেকে ফিরে আজ তাঁরই বাড়িতে মিষ্টি-জল খাবে। অনূঢ়া কন্যা, তায় আত্মঘাতী। শাস্ত্রে কোনো দায়বন্ধন না-ই থাক, আত্মার শান্তি কামনা ক'রে কিরণবাবু নিজের খরচে ছেলেদের খাওয়াবেন। হাসপাতালেও বুঝি দেবেন ক'টা টাকা। ছেলেরা ধন্য-ধন্য করেছে, আর চলে এসেছেন কিরণবাবু। বাড়ি ফিরে স্নান করেছেন। সরবত খেয়েছেন। এখন চিঠি হাতে নিয়ে বসে আছেন। বেলার চিঠি। তাঁকেই লেখা।

এই শেষ চিঠি হাতে নিয়ে বসে কিরণবাবু পাথর হয়ে গিয়েছেন। মনের ভেতরে আজন্মের স্থৈর্য, প্রশান্তি আর আত্মপ্রসাদ ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে। বিকেলের রাঙা-আলো কিরণবাবুর চোখের সামনে কালিন্দীর কালো হয়ে যাচ্ছে। বেলার মুখখানা মনে পড়ছে। শীর্ণ মুখ। মুদিত চোখে আর ঠোঁটে যেন বিমূঢ় একটা বিস্ময়। চোখের কোলে জলের দাগ। কত কষ্ট, কত দুঃখের স্বাক্ষর সেই চোখের জল? কোনোদিন জানবেন না কিরণবাবু। আর কোনোদিন কিছু জানতে পারবেন না বেলার সম্পর্কে। শুধু হাতের চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে পারবেন।

চিঠিটা আবার খুলে ধরেন। দেখেন বেলার কাঁপা-কাঁপা হাতের লেখা। 'শ্রীচরণেষু কাকাবাবু'—সম্বোধন করে সুরু করেছে বেলা। তারপর যা যা লিখেছে, কিরণবাবু মন ঠিক করে পড়তে পারেন না। অক্ষরগুলি জড়িয়ে পেঁচিয়ে যেন কেমন হয়ে যায়। বার বার মনে হয় বেলার কথা। অমিয়বাবুর মেয়ে বেলা। যার সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব তিনি অনুভব করেননি। স্বীকার-ও করেননি। অথচ যে অন্ধবিশ্বাসে তাঁকেই সব কথা বলে গিয়েছে। সব ভার দিয়ে গিয়েছে।

বেলার মা'র কথা স্বতঃ-ই মনে পড়লো।

অমিয়বাবুর সঙ্গে বেলার তত সাদৃশ্য ছিলোনা। সে ছিলো তার মায়ের মতো। লাজুক, আর সঙ্কুচিত স্বভাবের একটি গ্রাম্য কিশোরীকে বিয়ে করে এনেছিলেন অমিয়বাবু।

কিরণবাবুর মনে আছে, বৌকে শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং অমিয়বাবু। স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তা ছাড়া, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি খুঁটিনাটিতে স্ত্রী পাছে কোনো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন, সেজন্য তিনি স্বীয় মালিকানা সর্বদা জাহির করতেন চেঁচামেচি করে। কিরণবাবুর বাড়ির প্রশান্তি সে তর্জন-গর্জনে প্রায়ই ভেঙে-ভেঙে যেত। অমিয়বাবু বলছেন ঃ

—কে তোমাকে বলেছিলো চট করে বাজারে পাঁচ টাকা খরচ করতে? আমার ভাইয়ের শ্বশুর এসেছেন—লোক লৌকিকতা কী করতে হবে, সে আমি বুঝব!

ক্ষীণ মহিলা-কণ্ঠ—শোনা যেত কি যেতনা—সে-কণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে আবার বীরবিক্রমে অমিয়বাবু বলতেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ—আমিই বলেছি তাঁকে আদর যত্ন করতে। তা ব'লে কী করবে না-করবে একবার জিজ্ঞাসা করবেনা? দরকার মনে করোনা?

পাঁচটাকার বাজার, মেয়ের পাঁচ-আনার রিবন-ক্লিপ, বারো-আনার ছিট-কাপড়, ভিখিরীকে বদান্য-হাতে বাসি ভাত দেওয়া, কোনো মাসে কয়লা-খরচ বেড়ে যাওয়া—এমনি সব বিষয় ধরে ধরে অমিয়বাবু স্ত্রীকে শাসন ক'রে চলতেন।

আর তাঁর স্ত্রীকে দেখেই সবাই বলতো—এমনটি ঠিক দেখা যায়না। স্বামীকে এমন মান্য করতে কেউ পারেনা।

আসলে মহিলার মন জুড়ে ছিল ভয়। অহেতুক, অযথা ভয় ভয়ে তিনি চুপ করে থাকতেন। কথা বলতেন না।

নেহাত অকালে যখন মারা গেলেন, ছয় বছরের মেয়েকে উত্তরাধিকারসূত্রে সেই ভয় দিয়ে গেলেন। আর, বছর না ঘুরতে অমিয়বাবু বিয়ে ক'রে আনলেন আর-একজনকে।

পাশাপাশি বাড়ি। দুই বাড়ির মাঝখানে আধকাঠা জমির একটা বাগান। ছয়বছরের একটা ফরসা রোগা মেয়ে এসে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো তাঁদের বাড়ির বারান্দায়। তাঁর মেয়েরা খাবার খেতো, মাস্টারের কাছে পড়তো, ইস্কুলে যেতো। শুকনো মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনদিন বা বেলা খেলতে পেতো, হাতে পেতো দুটো-একটা খাবারের ভাগ—নইলে বেশীরভাগ দিনই চলে যেতো বেলা হলে। সেই পোড়া বাগানটায় মুখ শুকনো করে ঘুরতো বেলা। অথবা বসে থাকতো।

কেমন করে তার দিন কাটতো, তা কি কখনো জানতে চেয়েছেন তিনি? ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন? মনে তো পড়ে না। অথচ বিজয়াদশমীর দিন একবার আদর করলে, হাতে দুটো মিষ্টি পড়লে, অথবা হৃদয়ের বদান্যতায়—'বড় ভালো মেয়ে বেলা—' এই কথা বললে তার চোখমুখ যেন জ্বলজ্বল ছলছল করতো আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায়।

আজ মনে পড়ছে—সে চোখে-মুখে যেন স্নেহমমতার কাঙালপনা লেখা থাকতো। আর কিছু নয়।

কি যে ঘুরঘুর করতো মেয়েটা! তাঁর স্ত্রী বলতেন—

যাও, বাড়ি যাও। বেলা একটা বাজে। এখন কি পরের বাড়ি থাকে?

চলে গেলে বলতেন—শিখবে কোথা থেকে? কোনো শিক্ষা-দীক্ষা কি আছে?

তাঁদের বাড়ির যে সুনাম আছে, সেটা রেখে চলতে কিরণবাবুর স্ত্রী-ও খুব তৎপর থেকেছেন। তাঁদের কত সুনাম! ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ভালো, চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি হয়না তাঁদের বাড়ি—মনেপ্রাণে তাঁরা ভদ্র, শিক্ষিত, সৎ।

বেলা একটু বড় হ'তেই তার একটি দুটি ভাই হলো। সেই ভাইদের কোলে নিয়ে নিয়ে বেড়াতো বেলা। বাপ যতক্ষণ থাকতেন, বাপের ভরাট গলা শোনা যেত।

—বেলা, ওপরে মুখ ধোবার জল দিয়ে যা।

—বেলা, জুতোর রং দিলিনা?

—কাপড় কেচে রাখিসনি কেন?

বেলা ছুটে ছুটে কাজ করতো। দোতলায় ভারী বালতি টেনে তুলতো। তার মাথার চেয়ে খাড়াইয়ে উঁচু ধুতি-শাড়ি—টিউবওয়েল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধুতো। বাবা চলে গেলে স্থুরু হতো সৎমার তর্জন গর্জন। আর কোলের ভাইটার গলার একটু কান্না শোনা গেলে, হাত খুলে যেতো বেলার মা'র। চড়ের শব্দ, মারের আওয়াজ, আর গুমরে গুমরে কান্না শোনা যেতো।

অমিয়বাবু কোর্ট থেকে ফিরলে স্ত্রী তাঁকে ফলাও ক'রে বলতেন। প্রথমা স্ত্রীর বেলায় অমিয়বাবু যত স্থকঠোর ছিলেন, রক্তের তেজ স্তিমিত হওয়াতেই হোক, বা অপরপক্ষ অনেক প্রবল ব'লেই হোক— দ্বিতীয়াকে তিনি কিছু বলতে পারতেন না। বরঞ্চ গৃহশান্তি রক্ষা করবার জন্যে বেলাকেই শোনাতেন দু'চার কথা।

কিরণবাবুদের বাড়িতে আলোচনা হতো। সৎমা যে কী নিষ্ঠুর, অমিয়বাবু যে কিরকম অন্ধ. বেলা যে কী হতভাগ্য!

কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু করেছেন কি তিনি? অমিয়বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হতো। কাগজ চেয়ে নিয়ে পড়তেন তিনি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসে খেতেন। কই, কোনদিন বলেছেন তিনি কিছু? অমিয়বাবুকে বলেছেন যে, বেলার ওপর অবিচার হচ্ছে? মা নেই, বা মামাবাড়ির জোর নেই ব'লেই একটা ছোট দশবছরের মেয়ের ওপর ঐরকম অত্যাচার চালানো অন্যায়? বলেছেন যে, বেলার ওপর ঐরকম অত্যাচার চালানো অন্যায়? বলেছেন যে, বেলার ওপর ঝি-চাকরও স্থবিধে নিত? তারাও তাদের সাধ্যমতো কাজ করিয়ে

নিতো বেলাকে দিয়ে। অথবা এমনই বলতো যে,—দেখো, আজ মার খাওয়াব'খন।

ঝি-চাকরের উস্‌কানিতেও কমদিন মার খেতোনা বেলা! কোনদিন কিরণবাবু তার প্রতিবিধানের কথা ভেবেছেন?

সেদিন ভাবেননি। পরের বিষয়ে কথা কয় অভদ্রলোক। কিরণবাবুরা সে-দরের মানুষ নন। তাঁরা বড় ভদ্র, বড় আত্মসম্মানী —পরকে ঘাঁটাতে নারাজ।

বেশ তো? তবে আজ কেন মনে হচ্ছে? মনের অতলে সেইসব কথাবার্তা নাড়াচাড়া দিচ্ছে? কেন এমন হয়?

বেলার অসুখের কথা এইসময়ে ধরা পড়লো। দশবছর বয়সে। সৎমা আসবার পর থেকে বেলার শোবার বন্দোবস্ত হয়েছিলো নিচের কোণার ঘরে। সে-ঘরে দেয়ালে মেঝেতে পেরেক পোঁতা সারি সারি। বেলার মা, ঠাকুমা, কাকা, ছোট একটা ভাই—সবাই মারা গিয়েছেন সেই ঘরে। বেলা ঘরে শুতে ভয় পেতো। শুতে যাবার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে কাঁদতো। রাতে বুঝি শুয়ে শুয়ে ঘুমও আসতোনা! আর ছোটভাইরা মজা পেয়ে শিশুসুলভ নিষ্ঠুরতায় বলতোঃ শুবি যখন, দেখবি পাশে কে শুয়ে আছে! ওঘরে ভূত আছে, জানিস না?

বেলার সকরুণ মুখ, একটা তেল-ভরা লণ্ঠন আর ঝি-এর সে-ঘরে শোবার জন্য মিনতি—কোনটাই কি চোখে পড়তো অমিয়বাবুর? তিনি ভয়কে বিশ্বাস করতেন না। এ ব্যবহারটাও যে অন্যায় হচ্ছে, তা কিরণবাবুর মা ও স্ত্রী আলোচনা করতেন। নিজেদের মধ্যে। নিচু গলায়।

কিন্তু কোনদিন বেলার মাকে সে-কথা বলতেন না তাঁরা। তাদের ব্যবস্থা তারা বুঝবে! এরকম কোথাও দেখিনি—কথা হতো এই পর্যন্ত।

সেইসময়ই বেলার হলো অসুখ। ব্রেন-ফিভার। অজ্ঞান হয়ে

রইলো বেলা ক'দিন। তখন কিরণবাবুও যেতেন বইকি। সামাজিক ভাবে খোঁজখবর নিতে। ডাক্তার বলেছিলেন—শরীর অপুষ্ট—মাথা পরিণত হতে চাইছেনা—মনের ওপর-ও চাপ পড়ছে যথেষ্ট। শুধু শরীরের খাদ্য নয়, মনটাকেও দেখতে হবে। প্রফুল্ল, ফূর্তিবাজ হ'তে হবে।

মেয়ের সম্পর্কে কোথাও যে অবহেলা হয়েছে তা বুঝতে পারতেন না অমিয়বাবু। ডাক্তার বলেছিলেন,—সব বাচ্চা তো শক্তসমর্থ নয়। এ হলো সেন্‌জিটিভ, কোমল মন এর। সহজেই আঘাত লাগে। সহজেই ভয় পায়। এর সঙ্গে ব্যবহার বুঝে-শুনে করতে হবে। নইলে, এখন না হোক আরো বড় যখন হবে—শারীরিক সব পরিবর্তন হবে,—তখন এর পক্ষে আবার মাথার সামান্য গোলমাল হওয়া অসম্ভব নয়।

অমিয়বাবু তা বোঝেননি। ডাক্তারটি যাবার সময়ে বলে গিয়েছিলেন—

যেমন দেখছি, ও একলা শোয়। ওর কাছে একজন থাকা দরকার, তাই নয় কি?

সেইসময় থেকে বেলার ঘরে ঝি-র শোবার ব্যবস্থা হলো।

অসুখ থেকে সেরে কিন্তু বেলা যেন কেমন হয়ে গেল। রোগা, মাথাটা বড়, গম্ভীর মুখ—আস্তে আস্তে হাঁটে, দেওয়াল ধরে ধরে চলে। অযথা গম্ভীর হয়ে থাকে। তার বাবা একদিন বলেছিলেন,—টনিক, দুধ এগুলো ঠিক ঠিক দিও বেলাকে। ডাক্তার বলেছে।

বেলাকে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে, টনিক খেতে হবে—এসব আলোচনা প্রায়ই শুনতেন কিরণবাবুরা। শেষ অবধি শোনা যেত: ভালো ক'রে যদি ডালভাতটা খায়, তাতেই কি কম পুষ্টি?

পাশাপাশি বাড়ি ব'লেই এত কথা কানে আসত।

তারপর, যখন বেলার বয়স—পনেরো-ষোলো বছর হলো—হঠাৎ জানা গেল বেলার মাথা-খারাপ হয়েছে। মাথা নিচু ক'রে মুখ

গুঁজে থাকে বেলা। বিছানা ছেড়ে ওঠেনা। খেতে চায়না। কোনো একটা যন্ত্রণার কথা বলে, আর আজেবাজে অর্থহীন সব কথা বলে।

দেখেশুনে ডাক্তার অমিয়বাবুকে জানালেন তাঁর সন্দেহই সত্যি। সামান্য অস্ত্রোপচার প্রয়োজন বেলার। শরীর স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছেনা। রক্তাল্পতা এবং আরো দোষ আছে। কলকাতায় নিয়ে গেলেই ভালো হয়।

অমিয়বাবু খুবই বিব্রত বোধ করলেন। সবে পয়সা হচ্ছে। দ্বিতীয়পক্ষের শ্বশুর মেয়েকে টাকা দিয়ে গেছেন কিছু। সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা প্রয়োজন। তিনি বললেন,—গেরস্ত-ঘরে অমন করা চলেনা! কি একটু হলো না হলো অমনি কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে? এ সব বাজে কথা আপনি কি বলেন, এমনি সারবেনা?

—সারবে। দিন দুই-তিনেই এ অবস্থাটা কেটে যাবে। কিন্তু সে তো আরোগ্য নয়। বার বার হ'তে হ'তে কী হবে না-হবে তা বলা যায় কি?

দু'দিনেই ঠিক হলো বেলা। কিন্তু সকলেই বললো,—তুই পাগল হয়ে যাচ্ছিলি, জানিস?

এমনি সময়ে একদিন কিরণবাবুর মা বলেছিলেন,—তোমার মার তো গহনা ছিল অনেক। তাই দিয়েই যদি চিকিৎসা করাতেন তোমার বাবা!

বেলা তখন নিজের সম্পর্কে ভীত হয়ে উঠেছে। সে পাগল হয়ে যাবে। এই অসুস্থতা তাকে মেরে ফেলবে, এই শঙ্কা তাকে তখন মরিয়া করে তুলেছে। তাই বেলা সাহস করে অমন কথা বলতে পেরেছিলো অমিয়বাবুকে। তার সে দুঃসাহস হয়েছিলো।

বলেছিলো,—বাবা, আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে? শুনেছি রাঙা-মাসীর ছেলে ডাক্তার। তাদের টাকা দিলে তারা যদি হাসপাতালে নিয়ে যায়? দেখায়?

অমিয়বাবু সেদিন তর্জন গর্জন করে বেলাকে যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন, পাড়াপড়শী তা আজও ভোলেননি। সে-কথাবার্তার মধ্যে, কু-বুদ্ধি ও কু-যুক্তি দেবার জন্য হিতৈষী পড়শীদের ওপর অনেক খোঁচা ছিল।

তারও পরে বেলা এসেছিলা একদিন। কাঁদতে-কাঁদতে। বিকেলবেলা। বলেছিল,—

কাকাবাবু, আপনি আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবেন? আমার মাসীমার বাড়ি? তাঁরা আমাকে দেখেননি, কিন্তু বিজয়াতে চিঠি লেখেন, পূজোতে টাকা পাঠান।—একটিবার পৌঁছে দেবেন?

জবাবে কিরণবাবুর স্ত্রী কাটা-কাটা কথায় ওজন ক'রে তাকে বলেছিলেন। আর তাঁর কথা শুনে বেলার বুঝতে এতটুকু দেরি হয়নি যে, তার প্রস্তাবটা কত অযৌক্তিক, কত অসম্ভব। একজন বয়স্থা মেয়েকে এমনভাবে নিয়ে যাওয়া যে চলেনা, তা বলেছিলেন। বলেছিলেন,—আমাদের সমাজ আছে, সংসার আছে, সব ভেবে চলতে হয়।

বেলা বলেছিল,—নইলে আমার চিকিৎসা হবেনা, কাকীমা। আমি যদি পাগল হয়ে যাই?

বিরক্ত হয়ে কিরণবাবু খবরের কাগজ তুলে মুখ ঢেকেছিলেন।

চলে গিয়েছিলো বেলা। ঐ একটা সদ্‌গুণ মেয়েটার। বুঝিয়ে দিলে বুঝতো, আর চট করে মেনে নিতো। 'কাকাবাবু' ডেকে, খুব একটা দাবি নিয়ে আসতো বটে—কিন্তু সহজেই বুঝতে পারতো যে সে অবাঞ্ছিত, আর সেই প্রত্যাখ্যান মেনে নিয়ে চলে যেতো চুপ করে।

কিন্তু খুব কি অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে? বুঝিয়ে বললে অমিয়বাবুই কি রাজী হতেন না? তিনি যদি নিজে দায়িত্ব নিতেন? পরের মেয়ের জন্য এতটুকু করা—সে কি একেবারেই দেখা যায়না?

মনোবিশ্লেষণ করেন কিরণবাবু। কী ছিল তাঁর প্রত্যাখ্যানের পেছনে? সমাজ, সংস্কার? না দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা?

তারপর বেলা তার জীবনে খাপ খেয়ে গেল। লেখাপড়া হলোনা। বছরে একবার, ছ'বার, তিনবার কষ্ট পায়! ঘরে পড়ে থাকে বিছানায়। মাথায় কষ্ট হয়, সব ভুলে যায়—আবার ওঠে, কাজ করে, খাটে, খায়। তার সঙ্গেও কেউ মেশেনা, সে-ও কারু সঙ্গে মেশেনা!

এমনি সময়ে হলো একটা আশ্চর্য ঘটনা। স্থানীয় স্কুলে কাজ নিয়ে এসেছিলো একটি ছেলে। বেলার ভাইদের সে পড়াতে আসতো বাড়িতে। কেমন করে যে বেলার সঙ্গে আলাপ হলো তার! হয়তো আলাপ সামান্য-ই—চোখের দেখাতে-ই মন টেনেছিল।

দেখতে তো সে মন্দ ছিলোনা। ছিপছিপে, ফরসা, বড় বড় চোখ, ভীরু চাহনি—বিষণ্ণ মুখ! অনেক চুলের একঢাল খোঁপা। উনোনে রান্না বসিয়ে সে চেয়ে থাকতো একদৃষ্টে কুপীর বাতির দিকে—সেই ছবিই দেখেছে মাস্টার। সেই ছবিতেই বোধ হয় আরো অনেক কিছু দেখেছিলো—যাতে সে অমন দুঃসাহসিক প্রস্তাব করেছিলো!

সে বিয়ে করতে চেয়েছিলো বেলাকে। অমিয়বাবু রাজী হয়েছিলেন। গোপনে চলছিলো বিয়ের প্রস্তুতি। আজ কিরণবাবুর মনে হয়—তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলো ছেলেটি। বোধহয় কানাঘুষা কিছু শুনে থাকবে। তা বিশ্বাস করেনি সে। তাঁকে এসে বলেছিলো,—আপনি স্যার, শহরে একজন ভদ্রলোক—সবাই জানে, আপনি কি বলেন? বড় দুঃখী মেয়েটি—মনে হয় কোনদিন-ও সুখশান্তি জানেনি।

কিরণবাবু তখন চুপ করে থাকতে পারতেন। তাঁর বিবেক তাঁকে চুপ করে থাকতে দেয়নি। চুপ করে থাকলে তিনি তাঁর কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হতেন। তাই তিনি বলেছিলেন খুলে। বেলার অসুস্থতার কথা তার রোগের সবটুকু ইতিহাস, সবই খুলে বলেছিলেন তার কাছে। এখন যে এটা দুরারোগ্য একটা মাথার রোগে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—তা-ও বলেছিলেন।

শুনতে শুনতে ছেলেটি যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিল। মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিলো। আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে কাঁপছিলো। বলেছিলো,—তবে তো অনেকদিনের ব্যাপার! না জেনে যদি বিয়ে করে ফেলতাম, কি কাণ্ডটা হতো। ওঁরা আমাকে কিছু জানাননি। বলে আপনি ভালো করলেন, স্যার। উপকার করলেন।

আর সেদিনই লক্ষ্মীব্রত-র থালা দিতে এসে বেলা তাঁর দিকে হঠাৎ যেন চোখ তুলে চেয়েছিলো সলজ্জ কৃতজ্ঞতায়। বেলার খোঁপায় একটা লালফুল ছিলো। কেন সে চেয়েছিল তাঁর দিকে?

সম্ভবত, সম্ভবত সেই ছেলেটি তাকে জানিয়েছিলো যে, বিয়েতে বাধা দিচ্ছে কিছু লোকে। জানিয়েছিলো যে, কিরণবাবুকে সে সব বলবে। কিরণবাবুর সমর্থন একটা মস্ত জিনিস। নৈতিক জোর পাবে সে।

কিরণবাবুর আজ বার বার মনে পড়ছে সেই লালফুল-গোঁজা খোঁপা—সেই সলজ্জ চাহনি। সে-চাহনিতে যত কৃতজ্ঞতা, তত নির্ভর। কিরণবাবু নিশ্চয় বাধা দেবেন না। কিরণবাবু তাদের সাহায্য করবেন।

কিরণবাবু যে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, সে কথা বেলা এমনি করে-ই বিশ্বাস করতে শিখেছিল।

সেদিন চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন কিরণবাবু। তারপর ছেলেটি চলে গিয়েছিলো শহর ছেড়ে। অমিয়বাবুর কাছে স্বীয় অক্ষমতা জানিয়ে। অমিয়বাবু উদ্‌ভ্রান্ত মুখে তাঁকে ধরেছিলেন রাস্তায়। বলেছিলেন,—কিরণ, তুমি একি করলে? সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে চাইল, তুমি ভাংচি দিলে? তুমি মেয়ের বাপ নও? মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তা তুমি জাননা?

কিরণবাবু নিজের যুক্তির কথা বলে চলে এসেছিলেন। অমিয়বাবুর সঙ্গে তার আর বাক্যালাপ হয়নি। অমিয়বাবু চলে গিয়েছিলেন বাড়ি। আর বেলা? বেলার সঙ্গে তাঁর যতবার দেখা

হয়েছে, বেলা কোনদিন এ অভিযোগ করেনি যে, তিনি তার বিয়ের একমাত্র সম্ভাবনা ভেঙে দিয়েছেন। তবে বাইরে সে আর বড় একটা বেরুতনা।

অভিযোগ করতে সে জানত না। ভাগ্যের সব পরিহাসগুলো-ই ছিল তায় ন্যায্য পাওনা। অন্তত সে তাই জানত।

আজ কেন বেলার মৃত্যুর পর সেই কথা মনে হচ্ছে? কেন মনে পড়ছে তাঁর মেয়ের বিয়ের রাতে—সম্প্রদান ক'রে হাওয়া খেতে তিনি ছাতে উঠেছেন, আর সাদা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে রান্নাঘর থেকে বেলা চেয়ে আছে তাঁর বাড়ির বাসরঘরের দিকে? তাঁর বাড়ির উৎসবের আলো উলটে গিয়ে পড়েছে বেলার মুখে।

চব্বিশবছরের অনূঢ়া এক মেয়ের সাদা সিঁথির কথা কেন মনে হচ্ছে?

অমিয়বাবু মারা গিয়েছেন তিনমাস আগে। বেলার ভাইদের নিয়ে সৎমা গেছেন কলকাতা। বেলার ব্যবস্থা তার বাবা-ও করেননি—মা-ও করলেন না। ব্যবস্থা হয়েছে যে, বাড়ির সবটুকু ভাড়া দেওয়া হবে। মফঃস্বলে আজকাল বাড়ির চাহিদা কম নয়। বাড়িতে একখানা ঘর নিয়ে থাকবে বেলা—বাড়িভাড়ার টাকায় তার চালাতে হবে। পঞ্চাশ টাকা তার পক্ষে অনেক।

বেলার সম্পর্কে ইদানীং অনেক কথা শোনা গিয়েছে। বাড়ীতে ও রাস্তায় সে বেনারসী সিল্ক জড়িয়ে ঘোরে। গায়ে জামা থাকে না। পড়শীরা তার স্বভাব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়েছেন। পাগল বলে মাপ করতে তাঁরা রাজী নন। ভাড়াটে খোঁজা হচ্ছে, ভাড়াটে আসবে।

বেলা এতদিন, এতবছর বাদে আবার এসেছিলো। বলেছিলো,—কাকাবাবু, আমি একলা থাকতে পারিনা—আমার ভয় করে। আমার নিজেকেই ভয় করে। আপনি ওদের বলুন, আমাকে যেন কলকাতা নিয়ে যায়।

তার ভাইরা সে-কথা শোনেনি। বলে গিয়েছে—তুই থাক, আমরা একটা ব্যবস্থা করবোই।

তারা যেতে-না যেতে বারোদিন বাদেই বেলা আত্মহত্যা করলো কেন? এতদিন যার ধৈর্য ছিলো—নিজের জীবনটাই যে পরের হাতে ছেড়ে রেখেছিলো—সে সহসা ধৈর্যচ্যুত হলো কেন?

যার এত ভয় ছিলো, সে এতখানি নির্ভীক-ই বা হলো কি করে?

কিরণবাবু চিঠিটা দেখেন—'কাকাবাবু, আপনাকে ছাড়া আর কাকে লিখিব? আমার বাঁচিতে ভয় করে। এ-বাড়িতে একলা থাকিতে থাকিতে আমার কেবলই মনে হয়, কবে আমি সম্পুর্ণ পাগল হইয়া যাইব। তখন কে আমাকে দেখিবে? তাই ভাবিয়া ভাবিয়া এই কাজ করিতেছি। আপনি তারক, বিমল ও মা-কে জানাইবেন। আপনি বলিলে তাহারা বুঝিবে। একলা-একলা বাঁচিতে পারিলাম না।'

কিরণবাবুর কাছে বেলা কাল সেইকথাই বলতে এসেছিল। যদি, যদি তাকে এ-বাড়িতে এনে রাখতেন, তবে হয়তো বেলাকে আত্মহত্যা করতে হতোনা। যদি, যদি তিনি এ না করে অন্য কাজ করতেন—যদি…যদি-র কোনো শেষ নেই!

•

দারোগাটি আবার এলেন। মুখোমুখি বসলেন মোড়া টেনে। ছোকরা মানুষ। এখনো অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েনি। বললেন,—বাড়িটা লক্ করলাম। কী অবস্থায় ছিলেন মহিলা! ভাঁড়ে একসের চাল নেই! বাক্সে একটা কাপড় নেই! বস্তাপচা বেনারসী ক'খানা। বিছানা, বালিশ সব যা-তা! আর কি জানেন? বালিশটা একেবারে ভিজে। সারারাত ধরে যেন কত কেঁদেছেন মহিলা। মনটা ঠিক করতে পারেননি। কেন, ওঁর নেই কেউ?

উঠে পড়েন। তারপর একটু ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন,—না ব'লে পারলাম না, স্যার। মারা গেলে পরে আপনি ঘাড় পেতে দায় নিয়ে

এত করছেন! বেঁচে থাকতে যদি এর সিকির সিকি-ও দেখতেন—তবে বোধহয় তিনি মরতেন না। অন্যদের কথা ধরিনা। কিন্তু আপনি…এমন একজন ভদ্রলোক পাশে ছিলেন…

কিরণবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন! সন্ধ্যে হচ্ছে। এখনই শ্মশান-যাত্রীরা আসবে। ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু একটি অণুপরমাণু মুহূর্ত তিনি নিশ্চল হয়ে থাকেন।

এখন তিনি নিজেকে আর বেলাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এটা যেন ঠিক একদিনের ঘটনা নয়। বেলা আত্মহত্যা করেছে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই ফুরিয়ে যাচ্ছেনা ব্যাপারটা। ডালপালা শেকড়ে যেন ব্যাপারটা মহীরুহ হয়ে উঠছে। এত বড় হয়ে উঠবে, তা তো ভাবেননি কিরণবাবু?

মনে হচ্ছে ভালোলোক হিসেবে তাঁরও দায়িত্ব ছিল। নইলে বেলা বার বার তাঁরই কাছে আসত কেন? তার বিয়ে যদি হতো… কে বলতে পারে, একটা সুস্থজীবন, একটি মানুষের ভালবাসা পেলে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠতোনা? নিঃসঙ্গ জীবনকে ভয় পেয়েছিলো বেলা—তাই সে চলে গেল। কিন্তু তাঁর কোনো দায় ছিলনা? কোনো দায়িত্ব ছিলনা?

শ্মশান থেকে ছেলেরা আসছে। ওরা তরুণ, ওরা সব-কিছু নিয়েই হল্লা করে বাঁচতে পারে। এইতো—এসে পড়লো, বুক দিয়ে করে গেল সব কিছু। ওদের খাওয়াতে হবে। এতক্ষণে কিরণবাবুর খেয়াল হয় যে মিষ্টি আনতে দেওয়া হয়নি। দশটাকার নোটখানা চাপা পড়ে আছে শেল্‌ফে।

বেলা কি বলতে এসেছিল?—আমাকে রাতে এখানে থাকতে দিন!

যদি দিতেন? তাহলে হয়তো মন ঠিক করতে না পেরে অমন কেঁদে-কেঁদে বালিশ ভেজাতে হতো না বেলার। সে প্রতিবেশীর মেয়ে না হয়ে যদি তাঁর নিজের মেয়ে হতো? অথবা তাঁর ভাইঝি

হতো? তাহ'লে কি তিনি এমন নির্মম ঔদাসীন্যে চুপ করে থাকতে পারতেন?

কোন্‌টা ভালো হলো?

এসে পড়েছে ছেলেরা। নামছে সাইকেল-রিকশা থেকে। কিরণবাবুর এগিয়ে যাওয়া উচিত, তৎপর হয়ে ওঠা উচিত কর্তব্যপালনে।

কিন্তু পা ওঠেনা। নিজের দ্বৈতসত্তা দেখে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন তিনি। টলে গিয়েছে ইমারত। তিনি মহানুভব নন। সে-পরিচয়টা কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছে বেলা।

তবে তিনি কী? কোন্ পরিচয় নিয়ে মুখোমুখি হবেন দুনিয়ার?

কিরণবাবু বৃথাই হাতড়াতে থাকেন মনটা পাঁতি-পাঁতি করে। একটা পরিচয়-ও খুঁজে পাননা। যেটা ধোপদোস্ত পোশাকের মতো তাঁর প্রকৃত সত্তাটা ঢেকে সভ্যভব্য করে দেবে।

বেলা একেবারে নিঃস্ব করে রেখে গিয়েছে তাঁকে।

ফর্সা মুখ শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অনিদ্রায় লাল চোখ, অপ্রকৃতিস্থ চাহনি। হাতের আঙুলগুলো অজানতে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। মাত্র দুই বছর বাদে দেখা। কিন্তু যুধাজিৎবাবুকে চিনতে অসুবিধা হয় ডাক্তারের। এত বদলে যায় মানুষ? মনের বিস্ময় অবশ্য মুখে প্রকাশ করেন না ডাক্তার। বলেন—বলুন!

যুধাজিৎবাবু ঝুঁকে পড়েন। বলেন—আমার সম্পর্কে অনীতা আপনাকে কি বলেছে, ডাক্তার? বলেছে আমি পাগল না?

ঠিক যে তা-ই বলেছেন যুধাজিৎবাবুর স্ত্রী, ডাক্তার সে কথা বলেন না। বলেন—

মিসেস সেন বলছিলেন, ঘুম হয় না আপনার! কতদিন হলো কষ্ট পাচ্ছেন?

অস্থির আঙুলগুলোকে বাধ্য করে অতিকষ্টে যুধাজিৎবাবু কাগজে তামাক ভরে পাকান। দেশলাই জ্বালেন। তারপর বলেন—ঘুম আমার হয় না। না ঘুমোতে ঘুমোতে পাগল হয়তো আমি সত্যিই হয়ে যাবো।

ডাক্তার বড় আলোটা নিভিয়ে ছোট বাতিটা জ্বালেন। নীল ও ঠাণ্ডা একটা আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। যুধাজিৎবাবু চোখের ওপর থেকে বাঁ হাতটা নামান। হেলান দিয়ে বসেন। তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করেন। বলেন—শুনে আমাকে কি পাগল মনে করবেন? কিন্তু না বলে আমার উপায় নেই। বেরাল, একটা বেরাল আমকে পাগল করে দিচ্ছে, ডাক্তার!

—বলুন!

পেশাদারী ধৈর্যে চুপ্ করে থাকেন ডাক্তার। যুধাজিৎবাবু বলেন—

তুই বছর আগে আপনার কাছে ইন্জেকশান নিয়ে গেলাম মনে পড়ে আপনার?

খুব মনে আছে ডাক্তারের।

তখন যুধাজিৎবাবু ইনজেক্শান নিচ্ছিলেন সাময়িকভাবে নষ্ট পৌরুষ ফিরে পাবার জন্য। আসন্ন বিবাহের আগে প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য যুধাজিৎবাবুকে সেদিনও কেমন গোলমেলে লেগেছিল ডাক্তারের। যুধাজিৎবাবুরা ঐ রকমই। বাইরে থেকে দেখে তাদের বোঝা যায় না। কোথায় কোন্ ফ্রেমে যে এরা খাপ খাবে, তা বোঝা আরো মুস্কিল। সেদিন যুধাজিৎবাবু ছিলেন লম্বা, পেশলদেহ, ছোট ছোট মদগর্বিত চোখ—শিকারে হাতে কড়াপড়া—বহির্দৃষ্টিতে পৌরুষের প্রতীক। তবে সেদিনও তাঁকে ঠিক ধরা যায়নি।

আজ সেই যুধাজিৎবাবুর স্নায়ুমণ্ডলী বিধ্বস্ত, অসহায় একটা শরণার্থী লোক। আজও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আর নিজের সম্পর্কে কি যে বলবেন ভদ্রলোক, ডাক্তার তা জানেন। যুধাজিৎবাবুর স্ত্রী সব কথা-ই বলেছেন। বলছেন—দেখবেন, আমি যা বলবো—অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে।

যুধাজিৎবাবু বলেন—তখনো আপনাকে আমার সবকথা বলা হয়নি। অনীতাকে বিয়ে করবার জন্যে আমাকে আমার পরিবারের কাছ থেকে কম কথা শুনতে হয়নি ডাক্তার। পরিবার ছাড়তে আমার আপত্তি হলো না। বলুন, বুকে হাত দিয়ে বলুন—অনীতার জন্যে একটা সাতকেলে পুরনো বাড়ী আর হাজারটা মান্ধাতার আমলের পাপ সম্পর্ক—ছাড়া যায় না কি?

মৃদু হেসে ডাক্তার বলেন—বলুন!

—চমৎকার ছিলাম আমরা। সেবার আমরা ঘাটশীলা গিয়েছিলাম বেড়াতে। কি যে খেয়াল হলো ওর, অনীতা নেহাৎ জেদ করে একটা বেরাল কিনলো। কালো আর ব্রাউন মেশানো একটা অ্যাঙ্গোরা বেরাল। বিশ্রী দেখতে।

বলতে বলতে যুধাজিৎবাবুর শরীরে যেন ছোট ছোট বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলতে থাকে। তিনি উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসেন। বলেন—

—একটা বেরাল! ভাবতে পারেন আপনি? আমি অনীতাকে নিয়ে মুরির লেকে গিয়েছি—কাশ্মীর নিয়ে গিয়েছি—যা যখন চেয়েছে তাই দিয়েছি। সব কিছু করেছি ওর জন্যে। আর আরো যা চায় ও, সব কিছু করতে প্রস্তুত-ও ছিলাম আমি। সেসব কথা মনে রইলো না তার। সব ভুলে গিয়ে একটা বেরাল কিনে বসলো অনীতা!

বেরাল, কথাটা এমন করে উচ্চারণ করেন যুধাজিৎবাবু, যে মনে হয় সাপ বা বাঘের কথা বলছেন! যুধাজিৎবাবু বলেন—

—আমাদের বাড়ীর ব্যাপার জানেন ত?

ছাঁটলোহার কারবারী এক পুরণো ধনী পরিবারের ছেলে যুধাজিৎবাবু। ডাক্তার জানেন ততটুকুই, যতটুকু সবাই জানে। ও বাড়ীতে সম্পত্তির জন্যে ভাই ভাইকে খুন করতে চেষ্টা করেছে, মা-কে ছেলেরা বিশ্বাস করেনি—দুর্নীতি, ব্যভিচার আর পাপ ও বাড়ীর উত্তরাধিকার। যুধাজিৎবাবু বলেন—

—ছোটবেলা থেকে চাকর ঝি-র হাতে মানুষ—আর ভূতুড়ে গল্প শুনেই হোক্, বা ঝি-রা ভয় দেখাতো বলে-ই হোক বেরালকে আমি ভীষণ ঘেন্না করি,—ভয় করি বললেই ঠিক হয়।

মানসিক বিকারগ্রস্ত, দুর্বলচিত্ত, হতভাগ্য মানুষটির দিকে চেয়ে থাকেন ডাক্তার। যুধাজিৎ বলেন,—

—আমার ছোটভাই একটা ডিপথিরিয়ায় মারা যায়। বেরাল সম্পর্কে সেজন্যও আমার ভয় ছিল। অথচ, আমার ঝি বিছানায় কালো একটা বেরাল এনে ভয় দেখিয়ে আমার কান্না থামত। ব্রেণফিভার-ও হয়েছিল আমার। অথচ সে ভয়ের কথা বললে মা হাসতেন। মা আমাকে বাঁচাতেন না। ভয়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে দিতেন। আমার

পরিবারের ওপর···আমার কোনো টান হয় নি—আমি ওদের-ও ঘেন্না করি···অনীতা সব জানতো। তবু অনীতা বেরাল কিনলো! বুঝতেই পারছেন তারপর থেকে আমাদের সম্পর্কটা কি রকম হয়ে দাঁড়ালো?

যুধাজিৎবাবু ডাক্তারকে যেন এতক্ষণ মুগ্ধ করে রেখেছেন। আর ডাক্তারও ভদ্রলোকের মনের গোলকধাঁধার আঁধার চোরাগলিগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন। যুধাজিৎ এবার বলেন, ফিসফিস করে—অনীতা আমার চেয়ে বেরালটাকে অনেক ভালবাসতো ডাক্তারবাবু! আমার অক্ষমতার জন্যে অনীতা আমাকে হয়তো ঘেন্না করতো! একটা মানুষকে ভালবাসলেও তো বুঝতাম। কিন্তু একটা বেরাল। বলবো কি—বেরালটা ওর সঙ্গে খেতো, ঘুমোত, বেড়াতে যেত। আমি যদি ওর কাছে যেতাম—বেরালটা পিঠ বাঁকিয়ে এমন করতো—যে ভয়ে আমি সরে আসতাম। ঐ বেরালটা নিয়ে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়তে বাড়তে এমন হলো, যে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, বেরালটা ওর হয়ে শোধ নিতে লাগলো আমার ওপরে! কেমন করে জানেন?

মনে করতেও শরীরে কষ্ট হচ্ছে, এমনই আর্ত মুখ করে যুধাজিৎ বলেন—আমি একলা ঘুমোই। রাতের বেলা ঘুমভাঙতে দেখি, দুঃস্বপ্নের মতো বেরালটা আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখ দুটো সবুজ আলোর মতো জ্বলছে—ডাক্তার! যদি বুঝতেন!

হাত দুটো মোচড়াতে থাকেন যুধাজিৎ। তারপর অসহায়ের মতো জল খান ঢক্ ঢক্ করে। একটু বাদে বলেন—তারপর আমি বেরালটাকে মারতে বাধ্য হয়েছি।

—কি করেছেন?

—মেরে ফেলেছি। গুলী করেছি।

ডাক্তারের এবার কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না লাগে। একটা বেরালকে গুলী করে মারবার পরে লোকটা বসে বসে সেই কথা বলছে?

যুধাজিৎ নীচু গলায় বলেন—তবু কি জানেন ডাক্তার, বেরালটা মরেও মরেনি। বেরালটাকে মারলাম যখন, তার আগে তিন-চারদিন ধরে ঝগড়া চলছিল আমাদের। আমি বলেছিলাম অনীতাকে, সুযোগ পেলেই আমি শেষ করবো বেরালটাকে। এই রাত্রির দুঃস্বপ্ন আর সহ্য করবো না। কিন্তু এত কথা বলবার পরেও সে রাতে বেরালটাকে খাঁচা থেকে খুলে দিলো অনীতা। নিশ্চয় অনীতা-ই খুলে দিয়েছিলো—নইলে সে-রাতে, আমার সেই বন্ধ ঘরে……রাতের অন্ধকারে…

যুধাজিৎবাবু এবার কাঁদতে থাকেন। অসহায়ভাবে চোখ দিয়ে জল পড়ে। গলা দিয়ে বিশ্রী ভাঙ্গা শব্দ বেরোয়। ডাক্তার বলেন, —কেন ভাবছেন আর? বেরালটা মরে গিয়েছে। আর কোন দিন-ও সে আসবে না।

মাথা নাড়েন যুধাজিৎ। বলেন—কেমন করে তা বিশ্বাস করি ডাক্তার? তারপর কি হয়েছে জানেন?

এবার যুধাজিৎবাবু যা বলেন, তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনই ভয়ঙ্কর। মানুষের মনে চোরাগলির অন্ধকার পিচ্ছিল পথে যে সব বিকৃত চিন্তাধারা বাস করে, যদি কখনো তার মুখ দিনের আলোয় দেখা যায়—দর্শকের চোখ বুঝি আতঙ্কিত হবে।

যুধাজিৎ এবার যা বলেন, তার উৎপত্তি কোন্ জটিল মনোবিকারে? যুগান্ত সঞ্চিত কুসংস্কার, ভয় আর অক্ষম অপরিণত এক মনের গহনে বুঝি এইসব ক্লেদাক্ত চিন্তা জন্ম নেয়।

যুধাজিৎ-এর কথায় জানা যায়—বেরালটা মরবার পর অনীতা এসে দাঁড়িয়েছিল। অনীতাকে চোখে দেখেননি ডাক্তার। ফোনে তার গলা শুনেছেন। অনীতা নাকি আশ্চর্য ফর্সা। বেরালটার দিকে চেয়ে চেয়ে তার ফর্সা মুখ আরো অনেক সাদা হয়ে গিয়েছিলো। সে তাকিয়েছিলো যুধাজিৎ-এর দিকে। মুখে কিছু বলেনি। তারপর মুখ ঢেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো ঘর থেকে।

এই ঘটনার পর আশ্চর্যভাবে অনীতা চুপচাপ হয়ে গেল। যুধাজিৎবাবুরও মনে অনুশোচনা হয়েছিলো। তিনিও সুযোগ খুঁজছিলেন কেমন করে অনীতাকে খুশী করা যায়। অন্ততঃ তিনি এটুকু বলতে চেয়েছিলেন—যা হয়েছে, তা এ্যাক্সিডেণ্ট। সেজন্য যেন অনীতা মনে দুঃখ না রাখে। তাঁর ওপর অভিযোগ না রাখে।

অনীতা তেমন কিছু বলতে সুযোগ দেয়নি। তবে একজোড়া কুকুর কেনবার প্রস্তাবে সে বলেছিলো—আর নতুন করে কিছু পুষবার তার ইচ্ছে নেই। সে শখ তার মিটে গিয়েছে।

এই কথার মধ্যে রাগের চেয়ে দুঃখের প্রকাশই বেশী দেখেছিলেন যুধাজিৎবাবু। তিনি জোর করেন নি।

এমনি করে ছ'মাস কাটলো। যুধাজিৎবাবুর মনটাও খানিকটা সহজ হয়ে এলো। এটা কিছুই নয়। বিকারমাত্র—এ রকমও ভাবতে লাগলেন তিনি। আর আশ্চর্যভাবে অনীতার মধ্যে এলো একটা পরিবর্তন। সে যুধাজিৎবাবু সম্পর্কে সহসা মনোযোগী হয়ে উঠলো। তাঁর খাওয়া-দাওয়া দেখে। চাকরদের ঘরে আসতে দেয় না। নিজে খেতে দেয়। নিজে কাছে বসে বই পড়ে। নিজে ড্রাইভ করে বেড়াতে নিয়ে যায়। জামা বা জুতো পর্যন্ত পরতে সাহায্য করে তাঁকে। এইখানে কথা থামিয়ে যুধাজিৎবাবু বলেন—

—নিজে আমি কিছু করিনা ডাক্তার······সব বিষয়ে আমি পরনির্ভরশীল।

বলতে বলতে হাত কাঁপে। সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করেন যুধাজিৎ। আবার সেই কাগজে তামাক ভরে—সিগার পাকিয়ে ধরাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মিনিট দশেক বাদে সফল হয়। যুধাজিৎ বলে চলেন—

দুইমাস আগে এক রাতে, সহসা ঘুমের মধ্যেই তাঁর একটা

বিপদের অনুভূতি হয়। বিপদ এবং আতঙ্ক। ঘুম থেকে যেন তাঁকে উঠতেই হবে। অথচ উঠলে পরে যা দেখবেন, তাতেও তাঁর আতঙ্ক হবে। আশ্চর্য, এই যে ঘুম ভাঙতে ভাঙতেই এসব কথা তিনি বুঝতেও পারছিলেন।

তারপর তাঁর ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙতে তিনি পাশ ফিরে অনীতার দিকে তাকালেন। যুধাজিৎ-এর গলা এবার নেমে এসেছে। তিনি ভাঙাভাঙা গলায় বলেন ভয়বিকৃত সুরে—ঘরে সবুজ বাতি জ্বলছে। সবুজ বাতির আলোয় সমস্ত ঘরটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আমার বিছানার পর একটা টেবিল। তার ওপাশে অনীতার বিছানা। সেই বিছানায় গুঁড়ি মেরে বসে আছে অনীতা। বুকের কাছে শাদা জামাটা এক হাতে ধরে আছে; আর গুঁড়িমেরে বসে চেয়ে আছে আমার দিকে। কালো চুলগুলো ঝুলছে মুখের সামনে। কোঁকড়া কোঁকড়া গোছা গোছা। সমস্ত শরীরটা অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে বাঁকানো—আর তার চোখ···

তার চোখ যে কার মতো মনে হলো···ওঃ, ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার···

তোয়ালে দিয়ে যুধাজিৎবাবুর মাথা আর মুখ মুছিয়ে দেন ডাক্তার।

মাথা তোলেন যুধাজিৎবাবু। বলেন—আমি বলেছিলাম, অনীতা তুমি অমন করে চেয়ে আছ কেন? অনীতা, আমার ভয় করছে। অনীতা শোনেনি। অনীতা হাসলো—সে হাসি যদি দেখতেন ডাক্তার। আমি চীৎকার করেছিলাম। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ওরা এসে আমাকে তোলে। আমার সেকথা মনে নেই। তারপর থেকে আমি আলাদা ঘরে ঘুমোই! ঘুমোই কি বলবো ডাক্তার ঘুম আমার আসেনা।—কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। সবাইকে অনীতা বুঝিয়েছে পাগল আমি! রাতের পর রাত—একটা রাত-ও আমার ঘুম আসে না। ঘুমের ওষুধ খাই, ইন্‌জেকশন নিই—কিন্তু

রাত হলে আমার আতঙ্ক বাড়ে। দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে দেখেছি তার পাশে অনীতার ছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে। দেখি আর ভয়ে আমার চোখের পাতা নামে না।

কত রাতে—কত রাতে অনীতা দরজাটা আঁচড়ায় আস্তে আস্তে—দেখে খোলা আছে না কি! কত রাতে আমাকে ডাকে নিচুগলায়—যুধাজিৎ, যুধাজিৎ! সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি জেগে দুঃস্বপ্ন দেখি। মনে হয় দেওয়ালে বুঝি ছায়া পড়লো—মনে হয় আঁধার থেকে কালো, সাদা, ব্রাউন মেলানো একটা বেরাল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বালিসের নিচে হাত দিতে ভয় করে। মনে হয় হাত দিলেই হাতে নরম লোমওয়ালা থাবা ঠেকবে। ভয়ে আমার শরীর ঘামতে থাকে! না ঘুমিয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে আমি যদি পাগল হয়ে যাই ডাক্তার।

ডাক্তার বলেন—নতুন একটা ঘুমের ওষুধ দিলাম। আমার মনে হয় আপনার ঘরে রাতে কারু থাকা প্রয়োজন। নিদেনপক্ষে কুকুর রাখুন ঘরে।

—কুকুর পুষতে দেয়না অনীতা।

—কোনো চাকর থাকতে পারে না?

—অনীতা দেবে না।

—চড়াবাতি জ্বেলে ঘুমাবেন তবে! ঘরে কারুকে রাখবেন—সব বিষয়ে শুনবেন কেন স্ত্রী-র কথা? এ ওষুধটায় আপনার উপকার হবে। আর দরকার হলেই আমায় ফোন করবেন।

—রাতে আপনি থাকতে পারেন আমার কাছে?

ছোট বাচ্ছাকে সান্ত্বনা দেবার গলাতে বলেন ডাক্তার—দরকার হলে আমরা তাও করি বৈ কি। তবে দরকার আপনার হবে না। আপনি তিনদিন ওষুধ ব্যবহার করুন। তা-হ'লেই দেখবেন যে উপকার পাচ্ছেন।

এবার ওঠেন যুধাজিৎবাবু। তাঁর সেক্রেটারী ধরে ধরে তাঁকে

নিয়ে যান। সেক্রেটারীকে বোঝাতে বোঝাতে এগিয়ে যান ডাক্তার কিছুটা পথ। বেরিয়ে যায় হাডসন গাড়ীটা!

এবার ডাক্তারের ফোনটা গুঞ্জন করে ওঠে। ফোন ধরতেই যুধাজিৎবাবুর স্ত্রী-র গলাটা আকুল প্রশ্ন করে—ডাক্তার, কেমন দেখলেন?

আশ্চর্য কণ্ঠ। যেন আদর করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা কইছে তাঁর সঙ্গে। ডাক্তার ইতিমধ্যেই আকৃষ্ট হয়েছেন। ফোনের কথাবার্তায় যেটুকু বুঝেছেন, মহিলা যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব। পরম দুর্ভাগ্য অনীতা দেবীর যে তাঁর নিয়তি ওরকম একজন জীবন্মৃত ব্যক্তির সঙ্গে গ্রথিত। ডাক্তারের অন্ততঃ তাই মনে হয়।

তিনি বলেন—আপনি যা যা বলেছিলেন, সবই মিলে গেছে। তবে কষ্ট যে উনি পাচ্ছেন তা ত' আর মনগড়া নয়। আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা যখন ওঁর মনে বাসা বেঁধেছে তখন...

—তখন কি?......

নিঃশ্বাস বন্ধ করে যে কথাগুলো শুনছেন মহিলা, সেটাও যেন ফোনে ধরা পড়ছে। ডাক্তার মনে মনে ভেবে নেন দ্রুত। তাঁর দীর্ঘদিনের পেশা-র অভিজ্ঞতায় এমনিধারা আরো রুগী এসেছে। এইসব মানুষ, টাকাটা কোন মতে খরচ করতে পারলে বেঁচে যায়। এদের কখনোই চটাতে নেই। মনোবিকারের রুগী যুধাজিৎ, বা তাঁর স্ত্রী অনীতা, কারুকেই চটাতে পারেন না তিনি। তিনি বলেন—তখন আপনার উচিত হচ্ছে ওঁকে এড়িয়ে চলা। ওঁকে না হয় ক'টাদিন আলাদাই থাকতে দিন। সেক্রেটারীর সঙ্গে হোটেলে...বা আপনিই না হয়...

—আপনার নার্সিংহোমে পাঠাব ওঁকে?

—দুঃখিত, একেবারে জায়গা নেই!

—তবে আর কোথায় পাঠাব বলুন? কে ওঁর খাওয়া দেখবে,

কি করবে? কি যে শিশুর মতো অসহায় উনি…কি জানেন ডাক্তার, ওঁর শৈশব থেকে আফিং ধরিয়ে ঝি-চাকর-গুলো ওঁর মাথাটা নষ্ট করে দিয়েছে। নইলে আমাকে উনি অবিশ্বাস করেন? যাক্, দরকার হলেই আপনাকে পাব তো?

—নিশ্চয়।

ছেড়ে দেন ফোন ডাক্তার।

তারপর দু'তিনটে দিন কেটে যায়। প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করেন ডাক্তার যে, এবার সেই আকাঙ্ক্ষিত ফোন আসবে। সেই আশ্চর্য কণ্ঠ আবার শুনতে পাবেন তিনি। কি গলা! যেন মধু ঝরে ঝরে পড়ছে, গলন্ত মোমের মত। শুধু গলায় যার এত মাধুরী, সে দেখতে না জানি কেমন? শুনেছেন যে সুন্দরী। শুনেছেন তাঁর অপর এক প্রাক্তন রোগীর কাছ থেকে। পেশাদারী আদবকেতা বিরুদ্ধ জেনেও অনীতার সম্পর্কে তিনি কৌতূহল জানিয়েছেন। তাঁর প্রাক্তন রোগী বিশেষ কিছুই বলতে পারেন নি। অনীতা সম্পর্কে জানবার ইচ্ছেটা তাই অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে। যা জেনেছেন তা টুকরো টুকরো কথা! জেনেছেন যে, মেয়েটি অজ্ঞাতকুলশীল। সম্ভবতঃ টাকা-পয়সার জন্যেই বিয়ে করেছিলো যুধাজিৎকে। অন্যথায় সুন্দরী একটি মেয়ের ওরকম অসম্পূর্ণ একটা মানুষকে বিয়ে করবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। আবার যুধাজিৎ-এর সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর আন্তরিক উদ্বেগ ও চিন্তা, সে পরিচয় তো ডাক্তার নিজেই পেয়েছেন। এই সব টুকরো টুকরো কথা জুড়ে কি একটা ছবি হয়? একটি মেয়ের ছবি? যাকে চোখে দেখা যায়নি, আর যার কণ্ঠ এক আশ্চর্য সম্পদ? মধুর মাদকতাভরা —যে কণ্ঠের কথা শুনলে মনে হয়, কথাগুলো যেন আদর করছে মুখ ছুঁয়ে, গলা ছুঁয়ে!

ফোন এলো চারদিনের দিন। সন্ধ্যারাতে। নার্সিংহোম থেকে করিডোর পেরিয়ে ঘরে আসতে আসতেই ডাক্তার শুনতে পাচ্ছিলেন বিপদের সঙ্কেতের মত ফোনটা তীক্ষ্ণ তীব্রভাবে বেজে চলেছে।

আরো কি, ফোনটা শুনেই তিনি বুঝেছিলেন যে এটা যুধাজিতের কোন খবর এনেছে।

ফোনটা তুলে নিতে না নিতেই সেই গলা এবার আকুতি নিয়ে ঝরে পড়লো তাঁর কানে—অজস্র বৃষ্টিধারার মতো। এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বিশ্রী একটা এ্যাক্সিডেন্ট। এখন ডাক্তারকে চাই। তাঁকে আনতে গাড়ী যাচ্ছে নার্সিংহোমে। আর একথাও তিনি বলে আসতে পারেন যে ফিরতে তাঁর রাত হবে। বাঁ হাতে ফোনটা ধরে ডাক্তার ডানহাতে কলিং বেলটা টিপতে থাকেন। যান্ত্রিক সুরে শব্দ হতে থাকে। এই শব্দ ডাকবে বেয়ারাকে। বেয়ারা ডাকবে জুনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্টকে। নির্দেশ দিয়ে যাবেন ডাক্তার। যাচ্ছেন একটু দূরে। ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে।

একটু দূরে নয়, অনেক দূর। বড়বড় গাছে ছায়াচ্ছন্ন একটা বাংলো বাড়ী। কম্পাউণ্ড ঘাসে ঢাকা। সমস্ত বাড়ীটায় একটা অযত্নের ছাপ সুস্পষ্ট। একদিনের সুপরিকল্পিত বাগান আজ জংলা হয়ে গিয়েছে। দেড়তলা বাড়ীটা যেন ঝাউগাছের সবুজে ডুবে আছে। কি চমৎকার! যুধাজিৎ-এর বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত স্থান বটে। ড্রাইভে-ও ঘাস জন্মেছে। গাড়ীর শব্দ ডুবে যায়। ভাগ্যে গাড়ী এসেছিলো। নয়তো পথ চিনে আসতে তাঁর অসুবিধে হতো।

গাড়ী বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যে মহিলা দুই হাত মোচড়াচ্ছিলেন আর ফোঁপাচ্ছিলেন—যাঁর পেছনে, আশে-পাশে কয়েকজন চাকর, দাসী, সবাই চিত্রিত পুতুলের মতো দাঁড়িয়েছিলো অদ্ভুত একটা ছবির কম্পোজিশানে—তিনিই অনীতা। ডাক্তারের দুইহাত তিনি চেপে ধরেন—কি হবে ডাক্তার? এ কি হলো?

কি যে হয়েছে, তা-ই বলতে বলতে ঘরে চলতে থাকেন মহিলা।

চড়াবাতি জ্বেলে বন্ধ ঘরে বসেছিলেন যুধাজিৎ সেন—ডাক্তারের কাছ থেকে আসবার পর। তারপর, আজ বিকালে…চাকরদের ছুটি ছিলো—অনীতা আর সহ্য করতে পারেন নি। না খেয়ে থাকতে পারে মানুষ ও রকম? এক রকম জোর করেই বাথরুমের দরজা দিয়ে তিনি ঢুকেছিলেন এক পেয়ালা দুধ হাতে। সঙ্গে সঙ্গে যুধাজিৎ আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন। সে চীৎকার মালী আর অন্যরা শুনেছে। তারপরেই নাকি তিনি পিস্তল তোলেন। অনীতা তাঁর হাত চেপে ধরেন। তার ফলেই এমন একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হলো।

যে ঘরে ডিভানে শুয়ে আছেন যুধাজিৎ, সে ঘরে যান না ডাক্তার। তার আগের ঘরটায় ঢুকেই অনীতা প্রায় ভেঙে পড়েন ডাক্তারের পায়ে—পুলিশের সামনে আমি যেতে পারব না ডাক্তার। আপনি বাঁচান আমাকে। কি হবে বলুন কেলেঙ্কারী করে? ও ফিরে আসবে? ওকে বাঁচানো যাবে?

দরজা বন্ধ করে দেন মহিলা। কাছে এসে বলেন—টাকাটা কোন প্রশ্ন নয়। সেটা বুঝেছেন?

আর খুব কাছে যখন আসেন মহিলা, ডাক্তার দেখেন যে তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল নেই।

সব মিটে গিয়েছে। সেই সন্ধেরাতটা গড়িয়ে গড়িয়ে এখন অনেক রাতে পৌঁছেছে। বিষ্টি নেমেছে অনেকক্ষণ। এমনি বিষ্টিতে জল জমে এদিকের পথে। আর জল জমলে গাড়ী চলে না। জলে ভিজে রাতটা বেশ আমেজী হয়ে উঠেছে।

লোকজন সবাই চলে গিয়েছে। একটা সবুজ বাতি মাথার কাছে জ্বেলে, শান্ত হয়ে শুয়ে আছে এমন একটা কিছু, যাকে আজ সন্ধ্যা অবধিও যুধাজিৎ সেন বলে ডাকা চলতো, এখন তাকে কোন নামে ডাকা না ডাকা সমান।

লোহার আলমারীটায় বন্ধ রয়েছে একটা মুখ আঁটা খাম। ডাক্তারের হাতে লেখা ডেথ্ সার্টিফিকেট।

এখন এই ঘরটায় কেউ নেই। ডাক্তার আর অনীতা বসে আছেন। ডাক্তারের সামনে ছোট একটা গ্লাস। কিন্তু হলফ করে ডাক্তার বলতে পারেন, তাতে চুমুক না দিলে-ও অনীতাকে তাঁর ভাল লাগতো।

দুই পা গুটিয়ে বসে আছে অনীতা। শাদা ঘাড় আর কাঁধ ছেড়ে শাদা সিল্কের আঁচলটা লুটিয়ে আছে সোফায়। ঘাড় কাৎ করে অনীতা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। কোঁকড়া কোঁকড়া গোছা গোছা চুল ঝুলছে। মুখে মিঠে মিঠে হাসি। আর ব্রাউন চোখ দুটো ভীষণ সজাগ। তাঁকে লক্ষ্য করছে। অনীতা বলে—

—কি যেন লিখলেন ডাক্তার? যুধাজিৎ পাগল? স্যুইসাইডের ঝোঁক ছিল তাঁর? যে কথাগুলো লেখা হয় সেগুলো বিশ্বাস করেন আপনি?

কথা নয়। ডাক্তারের মনে হয়—শাদা থাবা দিয়ে কথাগুলোকে আদর করে লুফে লুফে তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে অনীতা। কথাগুলো এবার নরম পালকের বলের মত তাঁর আশে-পাশে ঝরে ঝরে পড়ছে। খুব ভাল লাগছে তাঁর। এত ভালো লাগছে, তবু তাঁর মাথা ঠিক আছে। কথাগুলো জড়িয়ে যাবে এই ভয়ে তিনি খুব আস্তে বলেন—না।

—না?

—না মিসেস্ সেন। যে কথা লিখেছি তা বিশ্বাস করি না।

—কি বলতে চান?

—কিছু না। যুধাজিৎ সেনের মৃত্যুর সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে—সব হবে—যা যা আপনার প্ল্যান ছিলো। হবে না-ই বা কেন? সবকথা ত' আর প্রকাশ পাবে না।

—কি কথা!

প্রায় শোনা যাচ্ছে না অনীতার গলা।

ডাক্তার গ্লাসটার ভেতর দিয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে বলেন, —এ কথা কেউ জানবে না যে আপনি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিয়ে করেছিলেন যুধাজিৎকে। আপনি কোনদিনও গভর্ণেস ছিলেন না দার্জিলিংয়ে। আসলে আপনি অভিনেত্রী। বোম্বাইয়ে ট্যুরিং একটা পার্টিতে আপনি ছিলেন। আপনার গলা আমাকে চার বৎসর আগে সুরাটের এক স্টেজে মুগ্ধ করেছিলো। সেই থেকে ভাবছি! আপনার গলাটা ফোনে শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো। আপনি পাকা অভিনেত্রী। ধরতে দেরী হলো। এখন সবটা ধরতে পেরেছি।

—কি করতে চান?

—কিছু না। কোন প্রমাণ অবধি আমার হাতে নেই। প্রমাণ আমি করতে চাইব-ই বা কেন মিসেস সেন?—আপনি আমাকে টাকা দেন নি?

—আমি আপনাকে টাকা দিই নি?

—আপনি আমাকে টাকা দেন নি? আমিও সেই কথাই বলছি!

—ডাক্তার!

এবার অনীতা প্রায় টপ্‌কে চলে আসে তাঁর সোফায়। পা তুলে গুটিয়ে বসে তাঁর কাছে! তারপর তার কালো নরম চুলভরা মাথাটা সোফার পিঠে এক বিশেষ ভঙ্গীতে ঘষে, আর অল্প অল্প হাসে। বাইরে বাড়তে থাকে রাত।

রাতটা একটা চূড়ান্ত প্রহরে পৌঁছে থেমে রয়েছে। সময় থেমে আছে। কিছু চলছে না।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। একটানা—একঘেয়ে। ডাক্তার সোফায় হেলান দিয়ে বসে—নেশায় মনপ্রাণ ডুবিয়ে একটা ছেঁড়া কথার টুকরো নিয়ে এখনো ভাবতে চেষ্টা করছেন। এই বৃষ্টিতে আর এই

রাতে সব কথা ভুকে গিয়েছে। শুধু ঐ কথাটাই কেন যেন চেতনা থেকে যেতে চাইছে না।

অনীতা কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। কালো কালো নরম চুল, শাদা মুখ আর ব্রাউন চোখ। চমৎকার।

ডাক্তার ভাবতে চেষ্টা করছেন, যুধাজিৎ বেরালকে এত ঘেন্না, এত ভয় করতেন কেন? অনীতা যখন এত সুন্দর?

ডাক্তার বুঝতে পারছেন না।

ছেঁড়া চিঠি

'তপন,

আজ তোমার সঙ্গে দেখা হলো, আর ঠিক তখনি রেবা আমাকে কি প্রশ্ন করছিলো। তবু আমি তোমাকে ঠিকই দেখেছিলাম তপন। দেখেছিলাম আর তোমার পাশের ঐ সুন্দর মেয়েটিকেও চিনেছিলাম। তোমরা অবশ্য আমাকে দেখতে পাওনি। দেখবে কি করে। সন্ধ্যার মুখে যে বৃষ্টি নামলো। তিন বছর হয়ে গেল, এই রকম বৃষ্টি পড়ছে চৌরঙ্গীতে দেখলেই কিন্তু আমার তোমার কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে এমনি বাস ষ্টপে দাঁড়িয়ে কত ভিজেছি, ঘরমুখো ট্রামবাস কত ছেড়ে দিয়েছি একটার পর একটা। আরো অনেক কথা মনে পড়ে, যা তুমিও জান, আমিও জানি, কিন্তু বলতে পারিনা। স্বীকার করতে পারিনা। আর কথা আমি কোনদিন-ই বলতে পারিনি। সব কথা তুমিই বলেছ। আজ তাই ভাবতে বসলেও কথা আমার হারিয়ে হারিয়ে যায়। মনে পড়ে সেই ছবি তোলবার দিনের ঘটনা। আমি তোমাকে বলছি

—এত সুন্দর কথা তুমি কি করে বল তপন?

তুমি বলেছ—উমা কথা বলোনা। কথা না বললেই যেন তোমাকে মানায়।

—সব কথাই কি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হবে?

—আমি যে কথা বেচে খাই—ঐ তো আমার কাজ।

এখন মনে হয় তুমি সত্যি কথাই বলেছিলে। তুমি হয়তো ছলনা করনি আমিই ছিলাম মূর্খ।

কিন্তু আজ কেন এমন হলো? তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ঐ সুন্দর মেয়েটি ছটফট করছিলো। কি ভাগ্য যে ও পেছনে ফেরেনি।

তা'হলে ইভা আমাকে নিশ্চয় চিনতো। চিনতো না? কতবার যে তোমাকে আমাকে একই সঙ্গে দেখেছে ওদের বাড়ীতে ঢুকতে? তখন অবশ্য ইভা বাগানে ঘুরে ঘুরে পড়ত। কোনও দিন বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতো। মনে হতো ও আমাদের দেখেও দেখছেনা। ওর বাবার কাছে তো অমন কতজনই আসছে নিত্য নিত্য। সকলকে মনে রাখবার কি দরকার?

চোখে দেখায় কোন বিপদ ছিলনা তপন তোমার কথা শুনলো ইভা, আর সেই হলো আমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। আমি কিন্তু বুঝিনি প্রথমে।

আজকে তোমরা বিষ্টিতে না জানি কেমন করে আটকে গিয়েছিলে। মেট্রোতে ছবি দেখে বেরিয়েছ। বুঝি বা গাড়ী আসেনি। অথবা এমন করে বিষ্টি নামবে তুমি বুঝতে পারনি। ভেবেছিলে সিনেমার পর একটু ঘুরে ফিরে বাড়ী ফিরবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো, নিশ্চয় তুমি এখন আর 'অশোক'-এ যাওনা। যাবে কেন? তখন তুমি ছিলে দেশী এক ওষুধের কারখানার মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। নামটা মত গালভরা, তোমার কাজটা তত দামী ছিলনা। মাস গেলে কতই আর পেতে? এই প্রসঙ্গে মনে হলো, আমিই তোমাকে একদিন তিনটে টাকা ধার দিয়েছিলাম। তোমার শরীর অসুস্থ ছিলো। ডাক্তার বলেছিলেন ফল, মাখন, দুধ খেতে। আমি আর তুমি দাঁড়িয়ে যদু বাবুর বাজারের মুখের দোকানটা থেকে সওদা করেছিলাম একই সঙ্গে। তুমি বলেছিলে

—উমা শেষ অবধি তোমার টাকা নিলাম?

আমি ঈষৎ হেসে মুখ একটু পাশ ফিরিয়ে বলেছিলাম—তাতে কি হয়েছে? শোধ ক'রো বৈশাখে।

বৈশাখে। বৈশাখ মাসটার কথা আমাদের দুজনের কথায় বার্ত্তায় বারবার-ই এসে পড়তো। তুমি বলতে—এমন সুন্দর

সস্তা দুটো বেতের চেয়ার দেখলাম, জানলে উমা? মার্চ মাসে সেই ইনসিওরেন্সের কমিশনটা পাবো। বৈশাখ নাগাদ কিনে ফেলবো।

—পর্দা দুটো এখনো রয়েছে দোকানে, দেখেছ? বৈশাখের আগেই কিনবার ইচ্ছে ছিল…

—না হয় পরেই হবে?

আবার যেদিন তুমি সেই ব্যাগটা কিনে আনলে—সেদিনও বললে

—দামটা বেশী হয়ে গেল যদিও। ষোলটাকা। তবে ব্যাগ কিনতে তো যাইনি! সেই কানফুল জোড়া দেখছিলাম। বৈশাখে ওটা তো কিনবোই!

টুকটুকে লাল পাথর আর একটি সোনার পাতা। ঐ কানফুলটাই হবে তোমার উপহার। এ কথা ছিলো। তুমি বলেছিলে

—অত যে লাল দেখছ উমা, ও কিন্তু খাঁটি পাথর নয়। চুনীর রং একটু ফিকে। ও হলো নকল পাথর। তবু বেশ দামী। ওগুলিই জড়োয়া সেট-এ চলছে।

—হোক না নকল! তবু সুন্দর তো!

দেখ, কতদূর এগিয়ে গিয়েছিলো আমাদের চিন্তাধারা। তোমার প্রথম উপহার। তা যে কি হবে, তা-ও আমরা ভেবে রেখেছিলাম। কানফুল, পর্দা, বেতের চেয়ার। এসব ছিলো তোমার ভাবনা। আর আমি? অফিসের পর বাড়ী ফিরতে ফিরতে ট্রামের গায়ে মাথা হেলিয়ে আমি কি বাসনের দোকানের ঐ বাসনগুলি দেখতাম না? আমি ভাবতাম সংসারের কথা। একটা ছোট হাঁড়ি, কড়াই, পেয়ালা, প্লেট, একটা জনতা স্টোভ এইগুলো আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। দাম যাচাই করেছি। দোকানদার বলেছে—কি দিদি, আজ নেবেন?

—পরে।

. বলে বেরিয়ে এসেছি। মনে মনে বলেছি সব নেব বৈশাখের আগে। ' চৈত্রমাসে তোমার ঐ ছোট্ট ফ্ল্যাটটা সাজাব দু'জনে মিলে। তোমার সঞ্চয় না-ই বা রইলো। আমার তো পাশবুকে রয়েছে চারশো টাকা। সংসারকে বঞ্চিত করে তো সে টাকা আমি রাখিনি। বাবাকে দিয়েছি। ছোট ভাই বোনের স্কুলের বই জামাকাপড় সিনেমার খরচ দিয়েছি। মা-কে হাঁপানির সালসা কিনে দিয়েছি। কারু প্রতি কোনো কর্ত্তব্যে ত্রুটি রাখিনি। তা সত্ত্বেও জমিয়েছি। ভেবেছি ঐ টাকা থেকে কিছু খরচ করে আমার নতুন সংসার পাতব। তুমি কত কথা বলেছ। বলেছ

—পুরুষে করবে শ্রম, আর মেয়েরা আনবে শ্রী। তবে না সুন্দর হবে সংসার? সুন্দর হবে, পূর্ণ হবে, সার্থক হবে।

বলেছ—দুটি পাখী নীড় বাঁধে, কত শ্রম করে তারা। আমরাও তেমনই দুইজনে মিলে কাজ করবো, ছবির মত সুন্দর করে তুলবো সংসার। জানো উমা, যখন চলি ফিরি, কাজ করি, সর্ব্বদা মনে হয় তুমি রয়েছে আমার পাশে। নিজে যেন আমি অসম্পূর্ণ। মনে-মনেও তোমাকে পেলে, তবে যেন মনে হয় সম্পূর্ণ হলাম আমি। কেন এমন হয় উমা?

আমি কথা বলতে পারিনি। তোমার কথা শুনে শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। ভরে গিয়েছে আমার মন প্রাণ। নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে থেকেছি আমি।

কিন্তু আজ? আজ কি তোমার সংসারে দু'জনে কাজ কর? ইভা কাজ করে? দু'জনের কাজে তোমার সংসার সুন্দর? তা ত নয় তপন। তোমাকে অতুল দত্ত সিমেণ্ট কোম্পানীতে বড় চাকরী দিয়েছেন। ইভাকে দিয়েছেন ছোট্ট একখানা বাড়ী। গোলপার্কের কোলে সে ছোট্ট বাড়ীতে বোধ হয় গ্যাসের রেঞ্জ, রেফ্রিজ, প্রেসারকুকার—যেমন সাজানো সংসারের ছবি আমরা সিনেমায় দেখি। শুনেছি তুমি হাজার টাকা পাও সব শুদ্ধ।

যে এত পায়, তার বৌ কেন কাজ করতে যাবে তপন? দরকার কি তার? সে কাজ করে না দুইজনে কাজ করবার কোন দরকার করে না। দুইজনে কাজ করে না। একজনের শ্রম আর একজনের শ্রী, দুইয়ের মিলনের কোন দরকারই করে না। তবু তোমার সংসার সুন্দর। তবু তোমরা সুখী। তোমার স্ত্রী-র হাসি মুখের ছবি দেখেছি বিলেতী টুথপেষ্টের বিজ্ঞাপনে। ছোটভাই বলছিলো।

—ঐ বিজ্ঞাপন দিয়ে টাকা পায় লোকে। ওর টাকার কি দরকার দিদি?

টাকার প্রশ্ন নয়। বলতে পারিনি সে কথা। বলতে পারিনি যে যাদের মনে সুখ আছে, তাদের হাসি অমন হয়। আর সেই হাসি ছবিতে ধরে রেখে ওরা বিজ্ঞাপন করে।

দেখ তপন, সে সুখের কোন ব্যাঘাতই হয়নি তোমার জীবনে। তবু তুমি যে অত কথা বলতে আমাকে? সেগুলি সুন্দর কথা ছাড়া কিছুই নয়।

শুধু কথা, তার পেছনে আর কিছু ছিলোনা। তাই সেগুলো বাতিল হয়ে গিয়েছে। রোজ এমন কত কথা হয় এই কলকাতায় তপন? কত কেরানী মেয়ে আর কত সাধারণ ছেলে পাশাপাশি চলতে, হাঁটতে, বসতে—ময়দানের সবুজ বিস্তৃতি-তে, পথে পথে, অথবা রাস্তার রেস্তোরাঁয়—এ সব কথা বলে? বলে আর পরে মিথ্যে হয়ে যায়?

তাই বলি দেখ তপন, কথা, শুধু কথা দিয়ে দিয়ে এক স্বর্ণজাল বুনেছিলে তুমি। সেই সোনালী জালের মতো অমন সুন্দর, অমন বিভ্রমকারী, অমন মায়া জাদু মাখা কিছু পাইনি আমার বাইশবছরের জীবনে। আমি পাই একশো পঁচাত্তর, আর তুমি পেতে একশো সাতাত্তর। হীরে, মণিমুক্তো, সোনা—সে সাঁচ্চা ছেড়ে ঝুটো কেনবার ক্ষমতা-ও তো আমাদের হতোনা। আর আমি তা চাইনি তপন। আমার সাদামাটা অভিজ্ঞতায়, সুন্দর, বা রঙীন,

বা · ঝকমকে কোন কিছু পাইনি। তাই তোমার সুন্দর সুন্দর কথাগুলিকে মনে হয়েছিলো উজ্জ্বল, লোভনীয়, আশ্চর্য। সেই কথার মণিমুক্তো ছিটিয়ে তুমি আমাকে জয় করেছিলে তপন।

সে কথার পেছনে আর কিছু ছিলো না। তাই আমার জীবনে সে বৈশাখ এলোনা, সে সব কথা সত্যি হলোনা। সেই কানফুল 'শো-কেসে'-এই রয়ে গেল, বা নিয়ে গেল কেউ, জানি না।

কথার তবে কোন দাম নেই? কোন ওজন নেই? তবে আজ, যখন বিষ্টির ছাঁট কমে এলো, তোমাদের ছাই রঙের ছোট গাড়ীটা ঘুরিয়ে এনে দাঁড়ালো ড্রাইভার—তখন, তোমার মুখে আলো পড়তে রেবা যখন বললো

—দেখ, উমাদি দেখ, সেই ছবিতে যিনি তোমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন ঐ ভদ্রলোক ঠিক তার মতো দেখতে নয়?

তখন আমি বললাম······। আমি কি বললাম, সে কথা থাক তপন, তবে আমার জবাব শুনে তুমি কেন শাদা হয়ে গেলে? কেন এমন করে ফিরে তাকালে? আমার চোখে চোখ পড়তে কেন এমন পাংশু হয়ে গেল তোমার মুখ? সোনালী চটিতে বিষ্টির জল ছিটিয়ে ইভা উঠলো গিয়ে গাড়ীটায়। কিন্তু তুমি একটু দাঁড়ালে। কেন দাঁড়ালে তপন? রেবা বলছিলো

—দেখ, উমাদি দেখ, সেই ছবিতে যিনি তোমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন, ঐ ভদ্রলোক, ঠিক তাঁর মতো দেখতে নয়?

তখন আমি বললাম······। কিন্তু আমি কি বললাম, সে কথা আবার-ও থাক। শুধু এই দেখলাম, যে কথার একটা ঘা তবে আছে। সে ঘা মেরে তোমাকে মুহূর্তের জন্যে হলে-ও দুর্বল করে দেওয়া যায়।

আশ্চর্য হলাম তপন। আশ্চর্য হলাম এই দেখে, যে আমার কথাতে তবু তুমি আঘাত পাও!

কথা বেচে খাও তুমি। এই বলেছিলে আমাকে। আজ ঘরে ফিরে সে সব কথাই ভাবছি।

মা-বাবা-ভাই সবাই গিয়েছেন বোনের শ্বশুরবাড়ীতে। ছোট বোনটিকে আমি আর ভাই মিলে বিয়ে দিয়েছি। কি জানো, আমার বোন, সে-ও তো আমারই মতো! মুখে অবশ্য কিছু বলেনি রমা। হরিণঘাটার দুধ সেণ্টারে কাজ করেছে, টিউশনী করে পড়েছেকলেজে। আই-এ, পাশ করে ও টাইপ শেখবার কথাই ভাবছিলো। দিদির পাশে দাঁড়িয়ে সংসারটাকে একটু সচল করবার কথাই ভাবছিলো। ভালো মেয়ের যেমন ভাবা উচিত। আমি যেমন ভেবেছি।

কিন্তু আমার বোন বলেই আমি ওর মনটাকে বুঝতে পারলাম। দেখলাম পোর্টকমিশনারের কেরানী ঐ ফর্সামতো লাজুক ছেলেটির সঙ্গে দুইচার দিন ঘুরতে। দেখলাম এক একদিন চোখে কাঙালপনা নিয়ে জানালা দিয়ে বিয়ের গাড়ী সাজানো দেখতে। দেখলাম বাজারের পথে যেতে আসতে এদিক সেদিক চেয়ে দেখতে। ছেলেটি পার্মানেণ্ট হলো, তা-ও জানলাম। বুঝলাম আমি ওর মনটা। তাই ওর মৃদু বা মুখর আপত্তি কোনটাই শুনলাম না আমি। বিয়ে দিলাম। বিয়ে দিলাম, সংসার পাতিয়ে দিতে সাহায্য করলাম। আমার সে চারশো টাকা এমনি করে কাজে লাগলো তপন। মুখে এত কথা বলতে পারিনা, তাই মনে মনে বলছি। সংসার পেতে রমা খুব সুখী হয়েছে।

আজ তাদের বাড়ীতেই গিয়েছেন সবাই। আমি যাইনি। যা-ই বলো, বিবাহিতা ছোট বোনের সাজানো সংসারে অবিবাহিতা বড় বোন গিয়ে যদি এক সন্ধ্যা-ও বসে, তবে তার চোখ ঐ বাসন-কোসন, ক্যালেণ্ডার, ফুলদানি, কুঁজোর মুখে গেলাস—সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরবে-ই। আর সেই চোখের মধ্যে অন্য মানুষ-রা নিশ্চয় একটা তৃষ্ণা, একটা আকাঙ্খা, একটা দুঃখ দেখতে পাবে। দেখতে পেয়ে মুখে না হোক, মনে মনে বলবে—দেখছে, মেয়েটার মন কি রকম ভিখিরী, দেখেছ?

এমনি ধারা যে সব কথা মনে মনে হয়, তাকে-ও আমি ভয় করতে সুরু করেছি তপন। তাই এইসব পারিবারিক প্রীতিভোজ বা উৎসবে আমি যাইনা।

আজ আঁধার ঘরে বসে বসে মনে করতে চেষ্টা করছি তপন। মনে করতে চেষ্টা করছি তিন বছর আগেকার সে সব কথা। মনে করতেই মনে পড়লো তোমার মুখ থেকে প্রেমের প্রথম স্বীকারোক্তি

—উমা, তোমাকে যে কালো বলে তার নিজের চোখে স্বপ্ন নেই। তোমার চোখ দুটি সে তো দেখেনি! তোমার চোখ দেখে কি মনে হয় জানো? বলতে পারি না। নিজের ভাষা নেই। ধার করা ভাষায় বলতে পারি

—'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ'

অথবা

—'পাখির নীড়ের মতো চোখ'......সত্যি উমা, এত ম্লান-মাধুরী আমি কারো চোখে দেখিনি।

সে কথা মনে হলো, আর হাসতে গিয়ে গাল আমার ভিজে উঠলো। আজ-ও। এই তিনবছর বাদে-ও। মনটা কি তবে মরে না? মনটা কি এইসব কথা এইসব স্মৃতি জড়িয়ে জড়িয়ে কাঙাল হয়ে বেঁচে থাকে? তাই, আজও সে কথা মনে পড়তে বুকের ভেতরটা ব্যথা করে উঠলো। জল নামলো চোখে।

কিছুই জানতামনা তপন। অত কবিতা, অত সাহিত্য। সুন্দর করে কথা বলবার কি যে নেশায় পড়েছিলে তুমি! তাই সংগ্রহ করতে ভালো ভালো কথা। পড়তে ভালো ভালো কবিতা। মণিকারের মতো তোমার কথাগুলিকে সাজাতে তুমি।

আমি তো তা জানতামনা তপন। ভিজে গাল আমার শুকিয়ে গেল। কিন্তু বিস্ময় আজও ফুরোল না। বিস্ময় যে আমার কত! সব চেয়ে বড় বিস্ময় এইখানে, যে তোমার সবটাই যে মিথ্যে, সাজানো, বানানো—তা আমি বুঝতে পারিনি। দেড় বছর ধরে

একসঙ্গে ঘুরে ঘুরেও বুঝিনি। আবার সেই কথা বলি। সাদামাটা জীবন-দেখা এক সাধারণ মেয়ে। সংসারে সাহায্য করতে লেখাপড়া করেছি। চাকরী করেছি। কথা যে অমন সুন্দর হতে পারে তা আমি জানতাম না। তাই তুমি আমাকে ভোলাতে পেরেছিলে। কথার মণিমুক্তো হীরে চুনীপান্না আমাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অজস্রধারে দিয়েছিলে। আমাকে মুগ্ধ করে আশ্চর্য করে দিতে পেরেছিলে। আমার মনে আছে, কত সময় একলা বসে সেইসব কথা মনে করে, আমি কাজ ভুলে গিয়েছি। অন্যমনে চেয়ে থেকেছি। দিবাস্বপ্নের নেশায় ডুবে থেকেছি। আমাকে বন্ধু-রা বলেছে, আমার বয়স না কি ঝরে গিয়েছে। দেখতে সুন্দর হয়েছি আমি। আমি মনে মনে বলেছি, একজনের কথার মাধুরী আমাকে সুন্দর করেছে। কিন্তু আজ? তুমিও চলে গিয়েছ, আর সেই সব চলে গিয়েছে। একেবারে দেউলে আমি। সবই যে ছিলো ফাঁকা, বুদ্বুদ, মিথ্যে, তা কি আমি জানতাম?

এই অতুল দত্ত-র কাছে আমিই তোমাকে নিয়ে যাই। ততদিনে আমার তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছে। তোমার বাড়ীতে-ও জেনেছে। আর মা তাঁর রুলি ছ'খানা ভেঙে আমার হার আর দুল গড়তে দিচ্ছেন।

অতুল দত্ত আমারই পরিচিত। আমার আগেকার অফিসের ম্যানেজার। নিজে ব্যবসা খুলেছিলেন। ভালোই করেছিলেন। চার পাঁচ বছরেই অবস্থা বাড়িয়ে ফেললেন। আমাকে কেন যেন স্নেহ করতেন বরাবর। আমার বর্তমান চাকরি এ-ও তাঁরই দয়াতে পেয়েছি। তোমার বা তোমার স্ত্রীর কথা নয়। তোমার শ্বশুরের প্রতি কিছু কৃতজ্ঞতা আমার আজও রয়েছে। অফিসের গোলমাল হলে, ভাইয়ের চাকরী ক্ষেত্রে অসুবিধে হলে, বা বাবার ইনসিওরের টাকার কোন অসুবিধে হলে আজও আমি তাঁর কাছেই যাই। আর অতুল দত্ত কোন দিনও প্রত্যাখ্যান করেন নি আমাকে। বরাবর সাহায্য করেছেন।

সেদিন আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে। বললেন—মিস সেন-ই আমাকে তপনের সঙ্গে যোগযোগ করিয়ে দেন।

বন্ধুটি হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। অতুলদত্তের বোধহয় মনে হলো, আরো কিছু বলা দরকার। তিনি বললেন—ভারী কাজের মেয়ে মিস সেন। সংসারের জন্য জীবনটা দিয়ে দিলেন।

তাঁদের কথা শুনতে শুনতে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না। এদের চোখে আমরা অর্থাৎ বয়স্ক অবিবাহিত কেরাণী মেয়েরা কতখানি তুচ্ছ, কতখানি অবান্তর।

আমি তখন-ও অতুলদত্ত-র কাছে মাঝে মাঝে যেতাম। যেতাম আর বাইরের ঘরে বসতাম। যে ঘরে বসে অতুল দত্ত বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিলো না। কানে শুনেছি তাঁর একই মেয়ে। তাঁর স্ত্রী-ও বড়লোকের মেয়ে আর অতুল দত্তের যা কিছু, তা ঐ মেয়েই পাবে।

আমাকে দেখে তিনি বড় জোর বলতেন—কি খবর মিস্ সেন? গুপ্ত কি গোলমাল করছে? আপনার ইনক্রিমেণ্ট-এর সে ঝামেলা মিটলো?

আমি তাতেই খুশী থাকতাম। তাই যেদিন বললেন

—আমার চেনাজানার মধ্যে চমৎকার একটা কাজ রয়েছে সেল্‌স রিপ্রেজেণ্টেটিভ। পেইণ্টের ব্যবসা। বেশ বলিয়ে-কইয়ে, দেখতে সুন্দর—একটি গ্র্যাজুয়েট ছেলে চাই। আছে না কি জানা? ভাই কত বড় হলো? ম্যাট্রিক দিচ্ছে?

সেদিন আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল তোমার কথা। তোমার কথা ছাড়া আর কার কথা মনে পড়বে তপন? তুমি দেখতে সুন্দর না হও, মন্দ নয়। তুমি স্মার্ট, তোমার কথাবার্তা চমৎকার—আর তোমার ভালো হলে, আমারও তো ভালো।

—কি, আছে কেউ ?

তখন আমি মনস্থির করে ফেললাম। বললাম

—আছেন একজন। দেখবেন তাকে ?

—বটে ? কি করে ?

—এম, এ, ইকনমিক্সে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। খুব ভালো ফ্যামিলি। আর যেমন স্মার্ট, তেমনই কথাবার্তা।

—ও !

বলে অতুল দত্ত এবার চেয়েছিলেন আমার দিকে। ভেবেছিলেন কোন আত্মীয়কেই হয়তো এনে হাজির করবো। ভেবেছিলেন, ওঁর কথা হয়তো আমি বুঝিনি। স্মার্ট, চালাকচতুর, কথাবার্তা, এ সব বলতে ওঁরা যা বোঝেন, আমি তা বুঝিনা। আমার আর ওঁর মধ্যে সবকিছুরই ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এ তফাৎ আছে বই কি। তাই উনি বলেছিলেন

—ছেলেটিকে একবার আনলে হয়।

আবার মুখ নিচু করে কি লিখতে লিখতে বলেছিলেন ঃ

—চাকরিটা ভালো। সবশুদ্ধ পাঁচশো। খুব সুন্দর কথা হওয়া দরকার। কথাবার্তা, ইংরেজী বাংলা, ভালো জানা দরকার।

আমার মনে হয়েছিলো এক অপরূপ সৌভাগ্য। একান্তই এক দৈবী সুযোগ। বলেছিলাম

—আপনি দেখবেন নিজেই ?

রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলাম তোমার বাড়ী। রাত ন-টার সময়ে তোমার বাড়ীতে যাওয়া অমন করে অনুচিত—সে কথা ভাবিনি। কোন কথা আমার মনে ছিলোনা।

আমি সেই একদিনই তোমার ঘরে গিয়েছি তপন। যে কথা বলতে গিয়েছিলাম তার উত্তেজনা তোমাকে এমন করে দিশেহারা করে দিয়েছিলো, যে তুমিও মুহূর্তের জন্যে কথা হারিয়ে ফেলেছিলে। দুজনেরই মনে হয়েছিলো পাঁচশো টাকার কাজ, হবে কি না হবে ! তুমি আমি পাশাপাশি বসেছিলাম তোমার খাটে। তুমি লুঙ্গি পরে

বসেছিলে, আমি তোমার পাশে। কিন্তু অতুল দত্তর সে প্রস্তাবে এত উত্তেজনা ছিলো, যে আমরা হুজনে প্রেমের কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। কই, যে-আমার স্বপ্ন মাত্রে-ও তোমার মন পানপাত্রের মতো ভরে ভরে ওঠে—সেই আমি বসেছিলাম পাশে। তোমার তো হাত ধরতেও মনে ছিলোনা তপন? আর আমি? আমি শুধু তোমাকে বলছিলাম—ভাল পোশাক পরে যেয়ো—ভাল ভাবে কথা ব'লো। না হয় হিন্দুস্থান ইয়ারবুক খানা পড়ে রেখো—যদি কিছু প্রশ্নই করে বসেন!

তুমি অন্যমনস্ক ভাবে বলেছিলে—সে কিছু নয়, আমি ভাবছি পোশাকের কথা! নীল শার্টটা ধুতে দিয়েছি! একটা শাদা ট্রাউজার যে এনে নিতে হবে। লণ্ড্রী থেকে ধার দিলে বাঁচি!

আমি আর তুমি একবার-ই তোমার ঘরে পাশাপাশি বসেছিলাম। কিন্তু অতুল দত্তের সে প্রস্তাব আমাদের এমন করে ভরে রেখেছিলো যে আমার চোখে কিছুই পড়েনি।

দেখ তপন, কি হুর্ভাগ্য আমার—কল্পনায় যে খাটে নিজেকে বৌ সাজিয়ে বসিয়েছি—যে ঘর গিন্নী হয়ে ঘুরে ঘুরে সাজিয়েছি—সে ঘরে গেলাম—বসলাম—কিন্তু চোখে আর মনে অন্য সব হুরাশা ছিলো। তাই সে ঘরটা যে কেমন, তা আর মনে পড়ে না। আজকে, এই আঁধার ঘরে বসে বসে কতবার ভাবতে চাই কেমন সে ঘর কোথায় কি ছিলো—কিছু মনে পড়ে না।

দেখ তপন, সেই স্মৃতিটুকুও আমার নেই।

তোমাকে দেখে অতুল দত্ত নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হলেন। তুমি আর আমি গিয়েছিলাম। তোমার পোশাক, তোমার জুতো, তোমার টাই বাঁধা সব নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, যে নিজের কথা আর মনে ছিলোনা। আমার পরণে যে সে-ই তিনদিনের কাপড়, চুল যে তেল চিটচিটে, চটি যে নোংরা—আমার সে খেয়াল ছিল না। তাই তুমি তখন গিয়ে বসলে—অতুলবাবু সকাল বেলাই যখন ঘরের ল্যাম্পটা জ্বেলে

দিলেন—সিগারেট দিলেন—তোমাকে—তোমাকে যে কি চমৎকার মানিয়ে গেল। তোমাকে মানিয়ে গেল, আর আমাকে মনে হলো বেমানান। ভীষণ বেমানান।

আর বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে তুমিও সেই কথাই বললে। বললে

—উমা, তুমি কিন্তু শাড়ীটা বদলে এলে পারতে!

আমি সেদিনও বুঝিনি। আমি বলেছিলাম

—আমি তো আর আসল লোক নয়। তুমি। তোমাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছিল এখনও দেখাচ্ছে!

তুমি আবার অন্যমনস্ক হয়ে নিজের কথায় ডুবে গিয়েছিলে। বলেছিলে

—উমা, আমাকে মানিয়েছিল? আমি ভাল করে কথা কইছিলাম?

—নিশ্চয়। আমার তো মনে হয় অতুল বাবুর খুব ভালো লেগেছে।

—দেখা যাক। সোমবার তো যেতে বললেন!

শুধু এক সোমবার নয়। সোমবার, মঙ্গলবার—কতবার গেলে তুমি! অতুলবাবু মুগ্ধ হলেন। সে কাজ তোমার হলো। নতুন কাজে তুমি এমন জড়িয়ে পড়লে, যে আমার সঙ্গে তোমার দেখাসাক্ষাৎ কমে গেল। তুমি ঘনিষ্ঠ হলে অতুল বাবুর পরিবারের সঙ্গে। আমাকে বোঝালে যে-সে ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন আছে। আমাকে হাসতে হাসতে এ-ও বলেছিলে

—এতে উন্নতি হবে উমা। তোমার আমারই ভালো হবে।

দুজনকে জড়িয়ে ভালো আর হলো কই তপন? আমি তো জানতামনা যে ঘনিষ্ঠতা বাইরে ছেড়ে অন্দরেও পৌঁছিয়েছে! আমি তো জানতাম না, যে-কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে-ই কথাই শুনছে ইভা! অতুল দত্তের দোতলার বারান্দায় বসে! খাঁচাতে একজোড়া রঙীন পাখীর শিস শুনতে শুনতে। কাচের ঘরে সমুদ্রের

মাছের ওঠানামা দেখতে দেখতে। সেই সুন্দর মনোরম পরিবেশে বসে না জানি তোমার কথাগুলি আরো কত সুন্দর হয়ে উঠেছিল তপন? আমি শুনিনি। আমি শুধু ভাবতে পারি।

মনে করতে পারি ইভাকে মুগ্ধ করতে তোমাকে কত কথা ভাবতে হয়েছে। কত কষ্ট করে সংগ্রহ করতে হয়েছে কথা। হবে না কেন? ইভা ত' আমার মতো এক কাঙাল হৃদয়ের মেয়ে নয়! যে চাইবার আগেই সব বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকে। যে শুধু কথার চাতুরীকে-ই বিশ্বাস করে। যে সাঁচ্চা ঝুটোর তফাৎ বোঝে না, জানে না।

ইভা আমার মতো এত স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়। তাকে মুগ্ধ করতে তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। ইভা তোমার দিন ও রাতের সবটুকু নিয়ে নিয়েছিল। তাই তোমার সময় মিলতো না।

আর একটা কথা মনে পড়লো তপন। মনে পড়লো, যে যখন সবই প্রায় জানাজানি হয়ে গিয়েছে, সবই জেনেছি আমি—ইভা আর তোমার বিয়ের কথা যখন প্রায় স্থির—তখন-ও আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিলাম। সেই অশোক রেস্তোরাঁয়। সেই মেট্রোর পাশে। অফিসের পর বসেছিলাম আমি গিয়ে। এক কাপ চা-এ সর পড়ছিলো, টোষ্ট ফ্যানের বাতাসে সিঁটিয়ে যাচ্ছিলো। আমি দেখছিলাম। তুমি এলে না।

তুমি এলে না, আমি গেলাম তখন অতুল দত্তের বাড়ীর দিকে। মাথায় পাগলামী চেপেছিলো। নইলে সেদিন, অমন করে যাওয়াটা কি আমার উচিত হয়েছিল? কেউ দেখলে কি ভাবত?

কিন্তু সে সব কথা আমার মনে ছিল না। যেতে হলো না ভেতরে। দেখলাম গাড়ী থেকে প্রজাপতির মতো তোমার কাঁধে হাত রেখে লাফিয়ে নামলো ইভা। তারপর তোমার হাতে হাত রেখে এগিয়ে গেলো ভেতরে। তুমি হাসছ, সে হাসছে, তার লোমওয়ালা কুকুরটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে পাশে পাশে। সবুজ কোমল ভীরু ঘাস মাড়িয়ে তোমরা চলেছ। ইভার শাড়ীটা সোণালী। কুকুরটার রং

শাদা। তোমার পরণে ধবধবে শাদা পায়জামা পাঞ্জাবী। কি স্বচ্ছন্দ সহজ তোমার সবটুকু!

দেখে আমি সরে গেলাম। তারপর হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে লাগলাম বালীগঞ্জ থেকে লেক, লেক থেকে টালিগঞ্জ ব্রীজ, ব্রীজ থেকে উত্তরে এগিয়ে ভবানীপুর—সেখান থেকে বাড়ী। বাড়ী পৌঁছিয়েছিলাম রাত এগারটায় আর হেঁটেছিলাম বুঝি পাঁচঘণ্টা। একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বোধহয়! নইলে কি কেউ অমন করে? হেঁটে হেঁটে পা আমার ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, তবু রাতে আমার চোখে ঘুম আসেনি। শুয়ে শুয়ে রাত ভোর হয়ে গেছে এক-খানা ছবি ভেবে—তুমি আর ইভা হাসছ, দুজনে গলা মিলিয়ে—গলা তুলে, চেঁচিয়ে, ভেঙে পড়ে! ইভার সোনালী আঁচলা সাদা ব্লাউজ ছেড়ে লুটোচ্ছে মাটিতে। উঁচু খোঁপায় সাদা ফুলের মালা!

দেখ তপন, কথা দিয়ে কথা গেঁথে গেঁথে যে সেতু বানালে, তা তোমার বেলা বেশ শক্তই হলো। তাতে পা ফেলে ফেলে তুমি ঠিক পৌঁছে গেলে উপরে—তোমার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে। আমার বেলা সবটা হয়ে গেল ফাঁকা হাওয়া।

আজ তোমার সঙ্গে দেখা। অস্বীকার করো না তপন, তুমি-ও আমাকে দেখেছ। আমায় কথা-ও শুনেছ! কথা না শুনলে তোমার মুখের চেহারা অমন হতো না।

রেবা বললো—ঐ ভদ্রলোক তাঁর মতো দেখতে, যিনি তোমার কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলেছিলেন।

এত জোরে বললো, যে সবাই তাকালো আমার দিকে। মনে হলো জবাব না দিলে এই অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে পারবো না। আমি তাই জোরেই বললাম—আমিও দেখেছি। আশ্চর্য সাদৃশ্য। তবে সে ভদ্রলোক তো নেই, তিনি তো মারা গেছেন!

শুনে তোমার মুখ শাদা হয়ে গেল। তোমার আমার মধ্যের সে কথার সেতু কবে ভেঙে খান্ খান হয়ে গিয়েছে, তাই আজ অন্য কোন

পথ ধরে তুমি এগিয়ে আসতে পারলে না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারলে না সাজিয়ে বানিয়ে কিছু বলে।

ভাবতে ভালো লাগছে, হয় তো আজ রাতে আমার মতো তোমার চোখেও ঘুম নেই। ইভার পাশে শুয়ে তুমিও হয়তো ভাবছ, এমন রূঢ় কথাটা আমি বললাম কি করে?

তপন অন্তত এই একটা রাত তুমি নিজের মনকে সত্যি কথা জিজ্ঞাসা কর। তোমার মন-ই তোমাকে জবাব দেবে।

তুমিই বল তপন, সে ছবির মানুষটা কি কোথাও বেঁচে আছে? যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলেছিলো, আর আমার আর তার হু'জনের কপিতেই লিখে দিয়েছিলো
আগামী বৈশাখের প্রতীক্ষায়—ফাল্গুন॥ কলকাতা।

সে আর কোথাও নেই তপন। পৃথিবীতে এত সুন্দর কথা, এত সুন্দর উপমা, এত ঐশ্বর্য আছে। তবু সবগুলি একত্র করে আর কোন সেতু গড়তে পারব না আমি! আর পৌঁছতে পারব না সেই বৈশাখে।

—উমা।

রঙ্গওয়ালী

মাজা রঙ, ছোটখাটো মানুষ। কালো চোখে আগুনের ফুল ফুটে ওঠে। আর সেই আগুনে পুড়ে মরে গোপাল। তবু ঘরের মানুষ। বিয়ে করা বৌ। ফুলকুমারী নাম। গোপাল বলে ফুলকি।

গোয়ালিয়র ফোর্ট। জমি ছেড়ে আশমানে বসত করছে মানুষ। অনেক বাড়ী-ঘর। আবার অনেক ফাঁকা। ফুলকির ঘর একেবারে পুব কোণাতে। বড় বড় নিমগাছের ছায়াতে আড়াল করা। ঘরখানি যেন ঝুল-বারান্দা। তারপরে আর কিছু নেই। সব ফাঁকা। সে রেলিং ধরে চাইলে চোখ পড়ে তিনশো ফুট নিচে ফোর্টের রাস্তা আর বড় বড় মূর্তিগুলোর মাথা। ভাগ্যে লোহার রেলিং দিয়ে আড়াল করা, নয়তো ভয়ে মরেই যেতো ফুলকি।

দোজপক্ষের বৌ। পারে তো চোখের মণিতে রাখে বৌকে গোপাল। কি ভাগ্য, যে বুকখানা তার মস্ত চওড়া। ঐ গুজারী-মহলের চওড়া কপাটখানার মতো। সেই বুকে মিলিয়ে গিয়ে তবে কিছু ভরসা পায় ফুলকি। সেও এক গুজারী মেয়ে। গোপাল যদিও রাজা নয়, তবু পুরুষের মতো পুরুষ তো। ফোর্টের প্রহরীর পোশাকে মানায়ও তাকে চমৎকার। জুলপির কাছে একটু পাক ধরেছে অবশ্য। বুকের লোম-ও কাঁচাপাকা মেলানো। তাতে ফুলকির এতটুকু দুঃখ নেই। সেই বুকে মাথা রেখে নিজেকে তার অনেক রানীর থেকে অনেক সুখী মনে হয়। এই মুহূর্তে গোপাল অনেক সুন্দর কথা বলতে পারে না। শুধু বলে,

—বড় বুঢ়া হয়ে গেলাম রে ফুলকি!

—কে বলছে?

—সবাই বলে।

—তোমার ঐ ছত্রী তো? কি জানে ছত্রী?

অল্প অল্প ফুলকি ছিট্‌কে ওঠে কথায় আর চোখে।

হা-হা করে হাসে গোপাল। বলে,

—না রে, না। পরমানুষকে তুই দোষ দিস্‌না ফুলকি। এ আমারই কথা।

—তুই অমন মুর্দা-কথা বলিস কেন?

—বলবো না।

—না, বলিস না।

—কেমন আশমান ছাখ্‌ ফুলকি।

সত্যিই চমৎকার। কাটা জানলার ফাঁক দিয়ে যেন আকাশখানাই এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। তারা-ভরা আকাশ। কালো শালের ওপর সপ্তর্ষি আর কালপুরুষের নক্সা-কাটা। বন্দী মুরাদের দীর্ঘশ্বাসে করুণ আকাশ। মানসিংহ আর মৃগনয়নার সঙ্গীতের সুরে সুন্দর এক গুর্জরী টোড়ীর আকাশ।

ঘরই যেন আকাশ। আর ফুলকি যেন বর্ণালীতে উজ্জ্বল সুন্দর একটি ছোট্ট পাখি। সেই পাখিকে এই রাতে মুঠোয় ধরেছে গোপাল। ফুলকির লাল ঘাগরা, হলুদ ওড়নী আর জর্দ্দা চোলী-ও রাতের রঙে রহস্যমাখা দেখায়। পান্নার মতো জ্বলে ছুটি চোখের তারা। ঝুরো চুল মাখা মুখখানা ছাখে গোপাল। গোপালের চোখ অনিমিখ। ফুলকি কি সে চোখের ভাষা বোঝে? বোঝে, যে মনে মনে গোপাল তাকে আশ্চর্য কোনো রাতচরা পাখি বানিয়েছে আর নিজে পঞ্চাশ টাকা মাস-মাইনে পাহারাদার হয়েও একখানা তারা ভরা আকাশের মালিকানা দিয়ে দিয়েছে তাকে? হয়তো বোঝেনা। অথবা ফুলকির মনে হয় এত আকাশ এত হাওয়া—সে বুঝি হারিয়েই গেল। তাই ছটফট করে ওঠে এতটুকু সসীম ভালবাসার জন্যে। বলে,

—খালি আকাশ আর বাতাস? কতদিন আমীন্‌ যাইনি বলতো? মনটা আমার বড় ছুখায়।

—নিয়ে যাব। নিয়ে যাব।

—তোর আশমান ভালো লাগে। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই বাজরা-ক্ষেতের বাস পাই নাকে। পাথরে হেঁটে হেঁটে পা-দুখানা আমার ব্যথা হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মন হয় যে চিরখির জলে পা ডুবে বসে থাকি।

—আর কি মন হয় ফুলকি।

—মন হয় চাচার ঘরের বোনদের সঙ্গে একজোট হয়ে বিয়ের গান গাইতে যাই চিরখির ওপারে। এর ঘরে তার ঘরে পরবের ডাল ভাঙি, রঙ্গোলী দিই দরজায় আঙিনায়।

—না, ফুল্‌কি। এখন আর তুমি মেহেন্দীলালের মা-বাপ-মরা ভাইয়ের বেটী নও। এর তার বাড়ী রঙ্গোলী দিতে হবেনা তোমাকে। ডাল ভাঙতে হবেনা।

গোপালের গলা গম্ভীর হ'লে ফুল্‌কি চুপ করে। হ্যাঁ এখন তার সম্মান বেড়েছে। গওনার পর থেকে যায়নি বটে চাচার ঘরে। চাচার ঘরে একবার যদি যায়, তো আদর যত্ন পাবে। দফাদারের মেয়ে তার চাচী। সেই পদমর্যাদার গর্বে বিয়ের আগে ফুল্‌কিকে মানুষ বলে পুঁছতো না। সেই চাচী-ই কত অবাক হলো। এমন বিয়ে হলো ফুল্‌কির! সেই কেল্লার ওপরে আশমানের বুকে কোয়ার্টার। সরকারের তন্‌খাদার স্বামী আর ননদ ভোজাই-এর কাঁটাবিহীন চমৎকার সংসার। বর্মার লড়াই ফেরত ছাঁটাই স্বামী গোপাল সিং। জমানো টাকা দিয়ে গা সাজিয়ে ঘরে আনলো বৌ। স্বামীর গর্বে সোহাগী কবুতরের মতো ফুলতে থাকে ফুল্‌কির মন। ভাবে স্বামী যে একরোখা। নইলে তাকে যদি একবার নিয়ে যেতে পারে আমীন্, তো দফাদারের ঘরে উৎসব পড়ে যাবে। তার চাচী হয়তো জামাইয়ের খাতিরে তোলা বাসনগুলো বের করবে।

ডাক্তার, ডাকঘরের বাবু, এমনিধারা ক'ঘরে ফুল্‌কি তোলা কাজ করে দেয়। ডাক্তারবাবু ছেলেমানুষ। ঘরে বৌ আসেনি। ঝাঁটপাট

দিয়ে মশলা পিষে দিতে দিতে ফুল্‌কি স্পষ্ট বুঝতে পারে ডাক্তারের চোখ-দুটি তাকে অনুসরণ করে ফিরছে। পুরুষের চোখের প্রশংসা ফুল্‌কি এমন চমৎকার পড়তে জানে। আর মানুষকে নাচাতে বড় ভালো লাগে তার। কোনো সময় কাছে এসে বলে,

—কাল রাতে মাথার দরদে ঘুমোতে পারিনা, সাব, হাতটা দেখবেন ?

—তোর মাথার দরদ হলো ? খুব সাহস তো দরদের ? গোপালকে ভয় করে না ?

ফুল্‌কিও হাসে। কাজে ঢিল দিয়ে ঘাঘরা বিছিয়ে বসে পড়ে মাটিতে। বলে,

—রোজ শহরে যান, সাব—একদিন আমিও যাব। ঘুরে আসব।

—সাহস আছে ?

—ইস্‌—পাহারাদারকে ভয় করি আমি ? শহরে আমারও চেনা জানা মানুষ আছে, জানলেন সাব ?

এমনি সময় গোপালের অস্থির ডাক শোনা যায়,—ফুল্‌কি ? ফুল্‌কি ?

কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে উঠে পড়ে ফুল্‌কি। বলে,

—আমার ঐ মুশকিল বাবুজি, কোথাও বসতে পারিনা এতটুকু।

ঘরে যেতে গোপাল বলে,

—টুরিস্‌ এলো কেল্লা দেখতে। আমার ডিউটি। তুই যা

এই কাজ খুব পছন্দ ফুল্‌কির। চট্‌ করে মুখ মেজে নেয়। পাকসাট মেড়ে ওড়না ঘুরিয়ে নেয়। মাথায় ওড়না টেনে মুখখানাকে সম্ভ্রান্ত করে। পায়ে প'রে নেয় পাতলা নাগরা। যাঁরা গাড়ী করে এলেন তাঁদের কথা আলাদা। হাঁটা-পথে নামতে বড় ভালো লাগে ফুল্‌কির। বিশাল দুর্গ। নেমে গেছে ঘোরানো রাস্তা। ফটকে ফটকে পাহারাদারদের পাশ দেখিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নামে ফুল্‌কি।

ট্যুরিস্টদের সেলাম জানিয়ে কেল্লা দেখাতে দেখাতে ওপরে ওঠে। অনভ্যস্ত দর্শকজন হাঁপিয়ে ওঠেন। ফুল্‌কি বেশ নিশ্চিন্ত নিশ্বাসে আস্তে আস্তে ওঠে। মিঠা গলায় সুন্দর বোলিতে বলে চলে,

এই সাব, মানমহল—গুজারীমহল। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ঐখানে সাব, তানসেনের জলসা হলো। ...এই সাব, জৈন্ গুরুদের মূর্তি দেখুন।...এই ঘরে বাদশা মুরাদ-কে কয়েদ করলো। এই শিকলে হাত-বাঁধা মুরাদ...নিশ্বাস ফেলুন সাব—এখনো কেমন শব্দ জানাবে।

রাজস্থানী গুজারী মেয়ের পোশাকে ফুল্‌কিকে দেখতে ভালোই লাগে দর্শকজনের। এইসব কিংবদন্তীর দিনের সঙ্গে তার যেন মিল পাওয়া যায়। তার মুখে গল্প শুনে বড় ভালো লাগে দর্শকজনের। মানমহলের মৃগনয়নীসুন্দরী আর অভিশপ্ত মুরাদের জীবন কথা শুনে দুঃখ বোধ হয়। মনে হয় ফুলকি যেন সেইদিনের কোন মাসন কন্যা। ইতিহাসের পাতা ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে।

বখশিশ দেন হাত ভরে কেউ। ঈষৎ নিচু হয়ে স্বীকার ক'রে স্মিতহাস্তে দাঁড়িয়ে থাকে ফুল্‌কি। বাইরের জগতের মানুষ সম্পর্কে তার আশ্চর্য মোহ আছে। তাদের সপ্রশংস চোখে নিজেকে দেখে নিজেরই প্রেমে পড়ে যায় ফুল্‌কি এমনি সব মুহূর্ত্তে। সে মোহ তার কাটতে চায় না। ঘরে ফিরে সেইসব সময়ে বেলা গড়িয়ে গেলেও চৌকা জ্বালাতে ইচ্ছে যায় না। গোপাল বলে,

—কাজকর্ম নেই?

—ভালো লাগছে না—

ক্ষিদের মুখে পুরনো ফৌজী মেজাজটা চাড়া দিয়ে ওঠে। কোনদিন দু'ঘা বসিয়েও দেয় গোপাল। চেঁচিয়ে কাঁদে ফুল্‌কি। ফুল্‌কির দুঃখে দুঃখী হবার অনেকজন আছে। তাদের শুনিয়ে চীৎকার ক'রে বিলাপ করে ফুল্‌কি। বলে,—এমনি বুঢ়ার হাতে পড়ে জান-টা আমার বরবাদ হয়ে গেল।

বলে—পারবনা আমি কাজ করতে। ঘরের কাজের বাঁদী হয়ে থাকতে পারবনা।

লছমন বা হস্‌রৎ—কেল্লার পিয়ন-আর্দালীরা ফুল্‌কিকে সহানুভূতি জানাতে চায়। তাদের উলটে কথা শুনিয়ে দেয় ফুলকি। বলে,

—মেরেছে, আমার ঘরের মানুষ মেরেছে। তাতে তোদের কি?

রাগ পড়লে গোপাল-ই ক্ষমা চায়। ফুল্‌কির গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে,

—মাপ কর্‌ ফুলকি। রাগ বড় দুশমন আমার।

—আমি আমীন্‌ চলে যাব। আমি ঘর করতে পারব না।

—আমি কোথায় যাব ফুলকি?

সে একটা মস্ত কথা। আর স্বামীকে ছেড়ে তেজ করে চলে গেলে তাকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেবে কেউ? সে ভরসা নেই।

গোপালের সই নিয়ে মাইনে দিতে দিতে সুপার সাহেব-ও এক এক দিন ঠাট্টা করেন। গলায় পরিহাস ফোটেনা। চোখ কৌতুকে ঝিলিক দেয়। বলেন,

—গোপাল, তোমার ঘরের হল্লা যে সকলের কানে পৌঁছে গেল।

—আওরৎ বড় বে-চ্যয়ন্‌, হুজুর।

—মাঝে মাঝে—নিয়ে গেলেই পারো শহরে।

—শহর বড় খারাপ জায়গা, হুজুর।

অনেক শহর ঘোরা মানুষ গোপালের মুখে এই শুনে আশ্চর্য মেনেছে ফুল্‌কি। বলেছে

—কেন?

—মানুষ খারাপ হয়ে যায়। এ ওর পিঠে চাকু মেরে দেয়। এক বন্ধু আর একজনের ঘরে ঢুকে বেইমানি করে।

শুধু শহরে নামবার কথাই নয়। ফুল্‌কিকে চোখের আড়াল করতেও বাধে গোপালের। রাতে উঠে কোনদিন ঝুঁকে পড়ে মুখখানা

দেখে গোপাল। এই মানুষটা যে একান্তই তার, সেই বোধটা আশ্বস্ত করে তাকে। ফুল্‌কি তাকে ঠাট্টা করে। বলে,

—এত ভয় তোমার?

—তুই কি বুঝবি ফুল্‌কি? কোনদিন নিজের ব'লে কিছু ছিলনা এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

—কেন?

—তুই তো আমার সব কথা জানিস না ফুল্‌কি!

সত্যিই জানেনা। আর এইসব স্মৃতিচারণার মুহূর্তে ফুল্‌কির মনে হয় স্বামী যেন তার একান্তই অজানা। কি-ই বা জানে সে! চাচার বাড়ী চাচীর লাঞ্ছনা খেয়ে দিন যাচ্ছিলো। আঠারো বছরের মেয়ে গলায় নিয়ে মরছিলো মেহেন্দীলাল। নেহাত দফাদার। অন্য মানুষ হ'লে পঞ্চায়েতে ঠেলতো। তবু কথাবার্তা হতো বইকি। আর সে-কথা শুনে ঘরে এসে কাকা তাকে মারতো। রাজপুতের ঘরে সেই কবে যেন মেয়ে হ'লে মেরে ফেলবার প্রথা ছিলো? পারলে, এরাও হয়তো মেরে ফেলতো একদিন ফুল্‌কিকে। রুটি, ভর্তা আর আচারের ঋণ শোধ করতো ফুল্‌কি গতরে খেটে। জোয়ান দুটো মোষের খড়-বিচালি কাটা, চিরখি থেকে জল বয়ে আনা বাঁকে করে, আর রান্না করা। শীত গ্রীষ্ম মানেনি ফুল্‌কি। যৌবনের শরীর। তাই সে-পরিশ্রমের ছাপ পড়েনি।

সে-জীবন থেকে তাকে উদ্ধার করলো গোপাল।

গোয়ালিয়র কেল্লার সিন্ধিয়া-স্কুলের এক পাহারাদার সে। বয়স হয়েছে। পয়লা বৌ নেই। ঘরবসত করতে একটি জোয়ান মেয়ে চাই।

গোপালও সব কথা বলেনি। বলেনি যে, জীবনে সে বারবার-ই ঠকেছে। বলেনি যে তাকে বঞ্চিত করে তার বাপ সৎমা আর ভাইদের নিয়ে সংসার পেতেছে। বলেনি যে, পয়লা বৌ পালিয়ে গিয়ে আর এক জনের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল। গোপাল তখন যুদ্ধে।

বলেনি, যে এই প্রথম একজনকে নিজের মতো করে পেয়েছে গোপাল। বলেনি এই কারণে যে, সে-সব দুঃখের কাহিনী এনে নিজেদের এই সুখের সংসারটাকে ছায়াকালো করতে চায়না গোপাল। এই ছোট ঘরখানাতে যেন দুনিয়ার যত সুখ সব এসে বাসা বেঁধেছে। গোপাল তাই সদাজাগ্রত ঈর্ষায় এই ঘরখানাকে বাঁচিয়ে চলে। ফুল্‌কিকে চোখের আড়াল হতে দেয়না। এত ভালবাসা নিয়ে-নিয়ে আর পারেনা ফুল্‌কি। হাঁপিয়ে ওঠে। সে আর নিতে পারেনা।

এতেই যদি ভরতো তবে কথা ছিলনা। এমন সময়ে গোপাল আর ফুল্‌কির সেই আকাশে ঝোলানো ঘরখানার তারা-ভরা বর্ণালীর রঙে নতুন ভাগীদার এসে জুটলো। গোপালের-ই এক বন্ধু আনোখী। বে-পরোয়া দিলদার মানুষ। সরঞ্জাম এক হারমোনিয়াম। গোপালের অনেক দুঃখের দিনের বন্ধু। মাঝারি মানুষ। হাসিখুশী চেহারা। শৌখিন পোশাক।

গোপাল যেন হাতে চাঁদ পেল। ফুল্‌কিকে বললো, খুব আদর-যত্ন করবি। পুরনো বন্ধু।

আজ গোয়ালিয়র কেল্লার সাহেব-মেম ট্যুরিস্ট এসেছেন। শহরের মান্য অতিথি। গাইডের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ফুল্‌কি। ফুল্‌কি সঙ্গে থাকলে দেখতে শোভা হয়। এ কথাটা বুঝেছেন থেকে আর আপত্তি ওঠাননি কেউ। কালোর ওপর লালফুল-ছাপা পুরোহাতা জামা সবুজ ওড়নী আর লাল ঘাঘরা। পায়ে নাগরা। সব চুল তুলে বেণী বাঁধা। হাতে মেহেন্দী, চোখে সুর্মা। কে বলবে কোনো গুজ্জারী মেয়ে? যেন এই কেল্লার পুরনো কোন্ বাসিন্দা চলেছেন মহল দেখতে। যেন পট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন রাগিনী পটমনজরী।

বৌকে দেখে সপ্রশংস চোখে তারিফ করলো গোপাল। আর মুচকি হেসে হারমোনিয়ামে একটা বেলোয়ারী সুর তুলে ছেড়ে দিলো আনোখী। বললো,

—গোপাল, খুব ভাগ্য তোমার।

একদিন আনোখী গোপালের সত্যই বন্ধু ছিলো। যদিও সে পাঁচ বছরের কথা। তখন গোপাল ছিলো বিষণ্ণ, গম্ভীর আর আত্মকেন্দ্রিক একটা মানুষ। নিজের মনে কাজ করে যেতো। কথা কইতে জানত না। সময় মিললে রামায়ণ পড়তো ব'সে।

আনোখী হারমোনিয়ামে ছোট ছোট সুরের ফুলঝরি তুলতে তুলতে গোপালকে ঠাহর করলো। মনে হলো মানুষটা আগের চেয়ে ভ'রে উঠেছে। ভালো লাগলো। একেবারে পথ-বসতি মানুষের স্বভাব আনোখীর। দরদী আর প্রেমিক। তাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতায় সে বললো

—বলো গোপাল, তোমার কথা বলো।

অস্থির তিনটে আঙুলে কুশলীর মতো হারমোনিয়ামে ছোট ছোট সুরের কাঁপন জাগিয়ে ঘরটার প্রভাতী আবহাওয়া সুরেলা করলো আনোখী। তারপর সুর থামিয়ে ঘাড় কাত করে চাইলো। বললো,

—বলো ?

প্রথমে সঙ্কোচ বোধ করেছিল গোপাল, তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলো ফুল্‌কির কথা তৃতীয়জনের কাছে বলতে খুব ভালো লাগছে তার। বললো,

—খুব দুখিয়ারী মেয়ে। চাচার ঘরে পড়ে ছিলো। সেই সময়.........

ফুলকির বিষয়ে আদ্যোপান্ত অনেক কথা বললো গোপাল। বললো,

—তুমি থাকো দু'চারদিন। একলা থাকে ও।

—বড় সুন্দর ঘরখানা তোমার। ঘর সুন্দর সাজিয়েছে ভাবী।

—যতদিন চাও থাকো।

আনোখী হাসলো। বললে,—না, গোপাল। আমি ঘুরতি-ফিরতি মানুষ। এইরকম একখানা ঘরে বেশীদিন থাকলে আমি হাঁপিয়ে উঠবো।

ডিউটি-তে চলতে চলতে গোপাল ভাবলো ফুল্‌কিও সেই কথাই বলে। ফুল্‌কি আর আনোখা। ফুল্‌কি চায় শহর বাজার, গাঁয়ের মাটি—আর আনোখা? ফুল্‌কি নয় সে জীবনের ক্লান্তি জানেনি। কিন্তু হাজার বাটের পোড়খাওয়া মানুষ আনোখী-ই বা কেন বাঁধা ঘর আর নিরাপদ আশ্রয়ের নামে নাক সিঁটকায়? নাকি পথঘাটের রাহী জীবনটা গোপালের একলার কাছেই ক্লান্তিকর? তাকেই শুধু ভয়ের মুখোশটা দেখিয়েছে তুনিয়া। আর আনোখার মতো ভবঘুরের কাছে নিজের রূপ-রঙের জেল্লাটা খুলে ধরেছে? যাতে নেশা ধরে যায় আনোখার? বুঝতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেল গোপালের মন।

পাঁচটাকা বখশিশ নিয়ে ঘরে ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল ফুল্‌কির। ঘরে ঢুকতে মনে হলো মেহ্‌মান আছে ঘরে। গোপালের ওপর রাগ হলো। জামায় ধুলো, ময়লা পাগড়ী—কি একটা মানুষকে ঘরে তুললো গোপাল! ঘরে এসে চৌকা ধরিয়ে কাপড় বদ্‌লে জল আনতে যাবে ডাক্তার সাবের কুয়ো থেকে, এমন সময় চমৎকার সুরের একটা ঝঙ্কার কানে গেল। তার-ই ঘরের সামনে নিমগাছ-তলায় বসে বসে সুর তুলেছে আনোখী। মানুষটার গুণ আছে তো? সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। তার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো আনোখী। বললো,

—বসুন ভাবী। শুনুন.........

বাজনাওয়ালার জীবনের সংগ্রহ মামুলী গজল গান। যার কথা-সম্পদ মনে হচ্ছে চাঁদ ও বুলবুলের প্রেম আর মাশুকের জন্য আশীক মনের বেদনা—

'মোর ইয়াদ্‌ মেঁ তুম্‌ ন আঁসু বহানা
ন দীপ জলানা
মোহে ভুল যানা...'

হারমোনিয়ামটার ব্যথার ভাণ্ডার কোথায় তা ঠিক জানে আনোখা। এই হারমোনিয়াম তার অনেক দিনের সঙ্গিনী। এর সঙ্গে

আনোখীর অনেক বসন্তের প্রেম। এই পুরনো প্রেয়সীর মর্মে ঠিক-ঠিক ঘা দিয়ে ঠিক তান-লয়ে কাঁদিয়ে তুললো তাকে আনোখী। আর ফুল্‌কি মুগ্ধ হয়ে গেল। এমনিধারা কিছু সে শোনেনি জীবনে। আমীন্ থেকে ঘর করতে এসেছিলো। কেল্লার উপর এসে উঠেছে। এমনি একটা মানুষও সে দেখেনি আর হাতের মামুলী পাঁচটা আঙুলে যে এমন যাদু জানা থাকে সে-ও তার অজানা।

সেই রাতে যখন জানালা দিয়ে আকাশটা নেমে এসেছে ঘরের মুখোমুখী, রাতটা সুরে সুরে ভরে তুললো আনোখী। খাটিয়ায় বসলো আনোখী আর স্বামী-স্ত্রী বসলো মাটিতে। ফুল্‌কির চোখ সুর শুনতে শুনতে ঘন সবুজ কোনো দুর্লভ পান্নার মতো দেখালো, আর তার মুগ্ধ মনোনিবেশ দেখে ঈষৎ হেসে আনোখী আরো অনেক সুর তুললো। সিনেমা দেখে যে সব প্রেমের গল্প শিখেছে, তার-ই সঙ্গে গান গেঁথে বেশ মন-ভোলানো পরিবেশ তৈরী করলো। বললো,

—শুনুন ভাবী, লায়লা-মজনুর কিস্‌সা। যখন কিস্‌মৎ দুজনকে দুদিকে ঠোক্কর লাগিয়ে দিলো, লায়লী মজনুর জন্যে গাইলো কি—

'আশমাঁওয়ালে তেরী দুনিয়া হামে বরবাদ কিয়াঁ
সারে দুনিয়ামেঁ চাদনী মেরী লিয়ে বাদল হো গিয়া।'

চট্ করে এই গজলের সুর তুললো আনোখী আর মুগ্ধ হয়ে ফুল্‌কি গোপালের দিকে চেয়ে হাসলো। বললো,

—কী চমৎকার!

গোপালও খুশী হলো। তার ফুল্‌কির মুখে এমন চমৎকার হাসি এনে দিয়েছে আনোখী! এখন কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে ফুল্‌কিকে। বললো,

—আনোখী, ভাবী তোমার বাজা খুব পশন্দ্ করলো।

রয়ে গেল আনোখী।

তার চলাফেরা, কথাবার্তা, আদব-কায়দা সব-কিছু সবসময় তারিফ করবার একজন গুণী মানুষ পেয়ে ফুল্‌কি অনেক উচ্ছল হয়ে উঠলো। ফুল্‌কির সম্পর্কে গোপাল এমনিতে কতো সজাগ। কিন্তু এইখানে সে বে-হিসাবী হলো! তার কারণ বোধ হয় আনোখীর স্বভাব। ফুল্‌কির সম্পর্কে তার বিশেষ আগ্রহ খুব বেশী দেখা যায়না। আর ফুল্‌কিও আচার-আচরণে কখনো অশোভন নয়। গোপাল মনে করলো—একলা একলা ফুল্‌কি থাকে। নয় একটু আমোদ করলো। একটু উচ্ছল হলো, তাতে দোষ কি! আর আনোখীর সঙ্গে মিশে মিশে ফুল্‌কির মধ্যে যেন আরো অনেক নতুন রং হাজির হয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে যখন তাকায়—গোপালের মনে হয় গ্যালারির ছবিতে যা দেখেছে; সেই মোগল রাজপুত্রের হাতে বসানো নানারঙা পাখির মতো সুন্দর ফুল্‌কি। 'বেশক্', 'কিঁউ নহী', এই সব সুন্দর কথার বুক্‌নি দিতে শিখেছে। তাতে এই মামুলী মানুষটার কথাও যেন হয়েছে মঞ্জুল। চেনা ফুল্‌কি একটু একটু করে নতুন হচ্ছে, আর দেখে মুগ্ধ হচ্ছে গোপাল।

একটা রক্তমাংসের মানুষ, তার মনে এমনি করে কোনো নতুন ভাব আসতে পারে, সে সম্ভাবনার কথা ভাবেনি কোনদিন গোপাল। গোপাল, ফুল্‌কি আর আনোখীর সেই দিন ক'টা ছিলো একান্তই নিশ্চিন্ত।

ঘরে তালা লাগিয়ে ফুল্‌কি আর আনোখী চলে আসে 'শাসবহু মন্দির, বা 'তেলী মন্দির'-এ। এতদিনকার চেনা জায়গা। তবু অনোখী যখন বলে,

—কী সুন্দর! মনে হয়—যেন এমন আর কোথাও দেখিনি।

তখন ফুল্‌কিরও মনে হয়, সত্যিই তো। রোজকার দেখা জায়গাগুলো যে এমন চমৎকার তা তো জানতোনা সে! 'শাসবহু'র সামনের অলিন্দতে দাঁড়িয়ে গোয়ালিয়র শহর ছাখে তারা। ফুল্‌কির

চুলগুলো ওড়ে, রঙীন ওড়না বাতাসে ঝাপটায়। যৌবন-সুঠাম শরীরের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়। আনোখীর অনেক দেশ আর অনেক মেয়ে দেখা দৃষ্টিও মুগ্ধ হয়। ফুল্‌কি বলে.

—কত কিস্‌সা জানো তুমি, কত দেশের—শোনাও।

—ঘরে কাজ নেই ভাবী?

—রোজ ভালো লাগেনা।

হাসে আনোখী। বলে,—একটা কথা বলি?

—বলো।

—যত কিস্‌সা জানি আমি, তাদের সবায়ের চেয়ে তুমি অনেক সুন্দর।

—ঠাট্টা করছো।

—ঠাট্টা করছি? না, ভাবী।

ঈষৎ গম্ভীর হলো আনোখী। এই কথা বলা উচিত হচ্ছেনা তার তবু বলতে ভালো লাগছে। আর এই সত্য যেন বিস্মিতও করছে তাকে এমনই গম্ভীর ও পরিহাস-বর্জিত কণ্ঠে সে বললো,

—ঠাট্টা নয়, ফুল্‌কি। ছ'দিনের জায়গায় দশদিন থেকে গেলাম, সে কিসের জন্যে তুমি বোঝনা?

—না! তা হয়না আনোখী—ব'লে ছুটে বেরিয়ে গেল ফুল্‌কি। ছুটে চললো ত্রস্ত পায়ে। নিজের ঘরে দোর দিয়ে খাটিয়ায় বসে মুখ ঢাকলো সে। কান মাথা মুখ গরম হয়ে উঠেছে। 'তুমি অনেক সুন্দর —এই কথাটি তার কানে বেজে উঠলো রিম্‌ঝিম্ করে। আর এই প্রথম যেন নিজের মনে চোরা গতিও বুঝলো ফুল্‌কি।

তার কথায় কি চটে গেল ফুল্‌কি? ভাবতে ভাবতে এলো আনোখী। কিন্তু ফুলকির ভাবগতিকে কোনো দ্বিধা দেখা গেলনা। তেমনিই সহজ!

সন্ধ্যাবেলা গোপাল রসদ কিনতে গেল শহরে। সুযোগ ছিলো। তবু গেলনা ফুল্‌কি। বললো, মাথা ধরেছে।

মাথা-ধরা যে ফুল্‌কির অছিলা মাত্র, তা জানতো আনোখী। তাই আজ বাইরেই বসে ছিল। আঁধারের সবটুকু রহস্য গায়ে মেখে এসে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। বসলো আনোখীর পাশে। ভয়ও করে, ভরসাও হয়। আনোখী বললো,

—ফুল্‌কি, ঘরে যাও।

—যাব না।

—ফুল্‌কি! তুই সত্যিই আগুন; আমার ভয় করে। আমি-ই চলে যাব।

—আমাকে নিয়ে যাবে আনোখী?

—তোমাকে?

—হ্যাঁ, আনোখী।

হাসলো না আনোখী। নিরীক্ষণ করে দেখল। বললো,—কতটুকু জানো আমাকে ফুল্‌কি? গোপালের কথা ভাবো।

ফুল্‌কি যখন এত কাছে তখন আনোখী বে-পরোয়া হতো কিনা বলা যায় না। শুধু কাঁকরের উপর গাড়ী থামবার শব্দ হলো। এক নিমেষে ঘরে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বক্‌বক সুরু করলো ফুল্‌কি।

—রোজ রোজ এত দেরি! আটা নেই, ঘি নেই। পারবো না আমি সংসার করতে।

কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে নেমে এল গোপাল। বললে,

—নে তোর জিনিসপত্র।—আনোখীকে বললো,

—বিয়ে করোনি ভাল আছ। দেখছ তো?

আনোখীর গলার হাসিটা কেমন শুকনো শোনালো। আনোখী বললো,

—গোপাল, কাল আমি চলে যাব ভাই।

—কোথায় যাবে? মেলা লাগবে কাল থেকে। মেলা দেখে যাও।

—মেলাতেই তো যাব। বাজা বাজিয়ে পারি তো দু'পয়সা কামাই করে নেব। দেখা হবে সেখানেই।

তবে যাবার কথা শুনে ফুল্‌কি বড় আনন্দিত হলো। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। বললো,

—সত্যিই তো। কতদিন আর ভালো লাগে বলুন! তা যাবার আগে আজ একটা কিস্‌সা হোক।

গোপালের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। ফুল্‌কির হাসি দেখে গা জ্বলে গেল আনোখীর। বললো,

—বাজাবো বইকি।

যাবার আগের দিনে কি আনোখীর ঘাড়ে ভূত চাপলো? আজ শুধু বে-শরম বে-দরদী সব পাথরের দিলের কথাই বাজালো সে। কিস্‌সায় তাদের কথাই বললো, যারা পতঙ্গের মতো রূপের আগুনের দিকে ছুটে যায়। আর যাদের জ্বালিয়ে দিয়ে আনন্দ করে আগুন।

মেলায় যাবার দিনে খুব সাজলো ফুল্‌কি। বড় ভীড় মেলাতে। মানুষের গায়ে গা দিয়ে চলতে-চলতে এমন দিঠি হানলো এ-পাশে ও-পাশে যে, মানুষ না তাকিয়ে পারলোনা। গোপাল যখন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাই-পাহারাদারের সঙ্গে কথা কইতে ব্যস্ত—ফুল্‌কি বললো,

—ঐ-যে মাস্টার-সাহেবের বোন আর আওরৎ। আমি আসছি।

পাশ কাটিয়ে এসে ছুটে চললো ফুল্‌কি। এদিকে, ওদিকে, কোন্‌দিকে রয়েছে আনোখা? হঠাৎ পাশ থেকে কানে বাজনা এল। ঘুরে ছাখে এইতো! লায়লীর সেই গান বাজাচ্ছে আনোখী

—'আসমাঁওয়ালে তেরী…'

ফুল্‌কির চোখে চোখ পড়তে যে আলো ঝল্‌কে উঠলো আনোখীর চোখে, তাতে মনে হলো—না, আসমানের মালিকের অবিচারে আজকে এই সন্ধ্যায় তার ছুনিয়া একেবারে বরবাদ হয়নি। ঝম্‌ঝমিয়ে

বাজনা তুলে মুগ্ধ শ্রোতার হাত থেকে রুমাল-বোঝাই পয়সা নিয়ে পকেটে রাখলো আনোখী। বললো,

—চলো।

এগিয়ে এসে দাঁড়ালো তুজন একটা গাছের কাছে। আনোখী বললো,—এত দেরি করলে কেন? কখন থেকে খুঁজছি তোমাকে? …আর…

—কি?

—এত সেজেছ কেন ফুল্‌কি?

—ভালো দেখাচ্ছে?

—কলিজা খুলে দেখাবো? দেখবে?

—না।

তুজনেই একটু ঘামছে, একটু হাসছে। উত্তেজনায় তুজনের বুক-ই ঢিপঢিপ করছে। আনোখী বললো,

—চলো মেলা দেখাই। চুড়ি পরবে?

—তুমি আমার হাতে কাঁচের চুড়ি পরাবে? মানুষ কি বলবে?

—বলবে, তার মনের মানুষকে আনোখী সোহাগ-চুড়ি পরাচ্ছে।

কাঁচের চুড়ি পরলো ফুল্‌কি। পান খেল। ফুলের গুঞ্জা পরলো মাথায়। তারপর গোপালকে খুঁজবার কথা মনে পড়লো। আনোখী ফুল্‌কির হাত চেপে ধ'রে বললো,

—কালকে-ও এসো। ওখানেই থাকবো আমি।

—এত ভীড়ে যদি দেখতে না পাই?

—তোমার জন্যে ঐ লায়লীর গীত বাজাবো।

গোপালকে দেখে তুজনেই হেসে এগিয়ে এলো। ফুল্‌কি বললো,

—খুব খুঁজেছ? আনোখীর সঙ্গে দেখা হলো।

—গোপাল, চলো মিঠাই খাওয়াবো। অনেক পয়সা কামাই করেছি।

গোপাল আর ফুল্‌কিকে পেট ভরে মিঠাই পুরী খাইয়ে দিলো আনোখী। ফুল্‌কি বললো,

—আনোখী আমাকে কত-কি কিনে দিলো ছাখো!

পরদিন গোপাল এলোনা। তার বদলী-ডিউটি পড়েছে। ফুল্‌কিকে পাঠিয়ে দিলো। বললো—রাত আটটায় গাড়ী আসবে। তুই চলে আসিস।

আজকে গোপাল সঙ্গে ছিলোনা বলেই হয়তো ফুল্‌কি প্রথম থেকেই বে-পরোয়া হলো। আনোখী বললো—লায়লীর গান বাজিয়ে আঙুল আমার ব্যথা হয়ে গেল ফুলকি। তবু তোমার এত দেরী?

তুজনে চলে এলো মেলার পিছনে। চালাঘরগুলির পিছনে উট আর বয়াল-গাড়ী। সেখানে দাঁড়ালো আনোখী। বললো

—তার পর?

—কাল ঘরে ফিরে মনটা এমন হলো! একি হলো বলো তো আনোখী?

—তুমি আমায় মারলে ফুল্‌কি। গরীব বাজাওয়ালা, তাকে খতম করলে।

—আমিও মরলাম।

—চলো ফুল্‌কি, কোথাও চলে যাই।

—গিয়ে কি করবো?

ভীরু গলা ফুল্‌কির। আর আনোখার কথাগুলি যেন তুরাশার গুনগুন গান

—চলে যাবো দিল্লী-আগ্রা-কলকাতা। আমি বাজা বাজাবো, তুমি গান করবে ফুল্‌কি…পথে ঘুমোব, চানা-মকাই খাব, দেশ-দেশ ঘুরব।

—যাব…যাব আনোখী। কিন্তু তোমার বন্ধু?

—সব ঠিক হয়ে যাবে ফুল্‌কি তু'দিনে জখম শুকিয়ে যাবে।

—ঠিক বলছো?

বলতে-বলতে ফুল্‌কি সত্যিই জ্বলে ওঠে। মদের মতো টলমল করে ফুলকি। বলে

—আমার দিন-রাত তোমার বাজার সুরে ভরে গিয়েছে আনোখী। ও-ঘর থেকে মন আমার ছুটে গিয়েছে!

—সত্যি বলছো?

—সত্যি।

আনোখীর যাযাবর রক্তে নীতির শাসন বড় কম। সে রক্ত সহজেই চঞ্চল হলো। ফুল্‌কির মন কী কথা বললো! গুজারী মেয়ের দুরন্ত যৌবন। নিষিদ্ধ বলেই প্রেম আরো মধুর মনে হলো। আনোখীর কাঁধে মাথা রাখলো ফুল্‌কি। বললো,

—যাব। গেলে সর্বনাশ হবে। তবু যাব।

চমক ভাঙলো যখন, তখন অনেক রাত। মেলার জৌলুষ নিভে এসেছে। ভয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ফুল্‌কি। বললো,

—ক'টা বাজে?

ঢং ঢং করে এগারোটা বাজলো। ফুল্‌কি বললো,

—সর্বনাশ হলো আনোখী। কেল্লার বাস তো চলে গিয়েছে। কি হবে?

মেলায় দোকান দিয়েছে যারা তাদের শরণাপন্ন হবে ফুল্‌কি? আনোখী বললো,

—আমি পৌঁছে দেব তোমায়

—না না গোপাল জানলে পরে…

—গোপাল জানলেও কিছু হবে না। শোনো ফুল্‌কি…

ফুল্‌কির নাম ধরে ডাকছে গোপাল।

—আনোখী, কাল আমি আসবো…

ব'লে ছুটে চলে গেল ফুল্‌কি। এগিয়ে গিয়ে আনোখী দেখে গোপালের হাত ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে ফুল্‌কি।

পরদিন-ই মেলা শেষ হবে। সম্ভবতঃ আজই চলে যাবে আনোখী আর ফুল্‌কিও যাবে তার সঙ্গে। গোপাল তো জানেনা, যে এই ঘরে শুয়ে আশমানের তারা দেখার দিন ফুরিয়েছে ফুল্‌কির। গোপাল হয়তো ভাবতেও পারেনা যে, ফুল্‌কি তাকে ছেড়ে যেতে পারে। গোপালের বিশ্বাসের গুরুভার-ই তো ফুল্‌কির পায়ে বেড়ি হয়েছে। সারাদিন মনটা থমথম করলো।

সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে বেরুবার মুখে গোপালের সামনে দাঁড়ালো ফুল্‌কি। বললো,

—ছাখো—

—ভাঙা-মেলার দিনে বুঝি আগুন জ্বালাতে যাচ্ছিস ?

—না।

মাথা নাড়লো ফুল্‌কি। বললো,

—একলা ছেড়ে দিচ্ছ, যদি ফিরে না আসি ?

—না-ই বা এলি।

—কী বললে ?

তীব্র গলা ফুল্‌কির। গোপাল হাসে। বলে,

—যেতে হয় যা-না। যেখানে মন চায় থাকবি—তুই খুশী থাকলেই হলো।

এই কথাতে খুব রাগ করতে চাইলো ফুল্‌কি। কিন্তু রাগ হলো কই ? গোপালের মুখের দিকে চেয়ে বুকটা তার যেন কেমন করে উঠলো। হাজার হলেও তিন বছরের সম্পর্ক তো ?

মেলায় অপেক্ষা করছিলো আনোখী। উত্তেজনায় পাণ্ডুর মুখ. জ্বলজ্বলে চোখ, ফুল্‌কি এসে পাশে দাঁড়ালো। বললো,

—চলো আনোখী !

—গোপাল ?

—এখনো গোপালের কথা ভাবছ ? চলো।

টাঙ্গা চলেছে। মোরারের রাস্তার ত্ব'পাশে গাছের ছায়া। আনোখী বলে,

—কিছু বললো না গোপাল?

আঁধারে ফুল্‌কির উচ্ছ্বসিত হাসির ফেণা ছড়িয়ে পড়লো।

—কিছু বললো না।

ফুল্‌কির মুখ দেখা গেল না, কিন্তু হাসির সুরটা এমন চমৎকার ভাবে খানিকটা অন্য সুর জড়িয়ে বেজে উঠলো যে, অবাক হয়ে গেল আনোখী। হাসতে-হাসতেই ফুল্‌কি বললো,

—খুব আজব লোক। বুঝলে আনোখী? বলে কিনা, যেখানে খুশী যা তুই। তুই খুশী থাকলেই হলো।

—ঠাট্টা করে বলেছে।

—ঠাট্টাই তো! এ-সব কথা ওর কাছে ভীষণ ঠাট্টা। মনে ভাবে আশমানের ওপর ঘর দিয়ে একেবারে বেঁধে ফেলেছে আমাকে ...মনে ভাবে কোনদিনও ফুল্‌কি চলে যেতে পারবে না! কিন্তু সে-সব কথা থাক। তুমি অন্য দেশের কথা বলো আনোখী...আগে তো আমরা আগ্রা যাবো, তাই না? তাজ দেখবো আমরা, আনোখী?

—হাঁ পিয়ারী, তাজ তো দেখাবোই...আরো কত কি! নিয়ে যাবো কলকাতা, বোম্বাই।

—সেখানে আমি কি করবো?

—আমি বাজা বাজাবো পিয়ারী, তুমি গাইবে নাচবে।

হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল ফুল্‌কি। পৌঁছে গেল স্টেশন।

ট্রেন আসবে। টিকিট খরিদের ঘণ্টা পড়েছে। কেল্লার উপরের আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। কী চমৎকার দেখাচ্ছে! তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফুল্‌কি বলে,

—আনোখী, ঐ গীত একবার বাজাও।

—এখন?

—হ্যাঁ, আনোখী।

ফুল্‌কির মুখের দিকে চায় আনোখী। বলে,

—যো হুকুম।

—আর কিস্‌সা-ও শুনাও।

—শোনো রঙ্গওয়ালী—এই গীত গাইল মজনুঁ যখন মরুভূমি ধরে উটের কারোয়াঁ চলে যাচ্ছে লায়লীকে নিয়ে।

—মজনুর গীত নয়, লায়লীর গীত—

হারমোনিয়ামে হালকা ঠেকা দেয় আনোখী। নীল আলো প'ড়ে ফুল্‌কিকে আরো আশ্চর্য দেখায়। সত্যিই রঙ্গওয়ালী। এক এক সময় এক এক রং। মেলাতে এলো জ্বলতে-জ্বলতে, যেন ফুলঝুরি। এখন ভাখো কেমন উদাস। আনোখী সুর তোলে,

'আশমাঁওয়ালে তেরি দুনিয়া হামেঁ বরবাদ কিয়া…

ফুল্‌কি কাছে ঘেঁষে আসে। বলে,

—কেমন করে তুমি বাজাও আনোখী? সব মরমের দুখ নিঙড়ে নাও!

আনোখী অল্প হাসে। বলে,—বুঝলাম।—তারপর বাজায়—'সারে দুনিয়ামেঁ চাঁদনী, মেরে লিয়ে বাদল হো গয়া…'

অনেক দূরে ট্রেনের হুইশ্‌ল শোনা যায়। ফুল্‌কি বলে,—ট্রেন এসে গেল, আনোখী।

—তব্‌ ভি তো সুন্‌ লে।…

আনোখী বাজায়, 'এ মালিক, ইয়ে তামাশা মুঝেকো কিঁউ দিখা দিয়া?'

আনোখীর বাজনা থামে না। তারপর চলে যায় অন্য গানে। বলে,

—এই গীতে আমারও মরম নিঙড়ে দিলাম, কিস্‌সাওয়ালী!

ফুল্‌কির চোখ ভরে অশ্রু নামে। প্রেমের কিস্‌সা ফেরী ক'রে ফেরে যে-আনোখী সে বলে,

'আঁসু কো সম্‌ঝো তুম্ আঁখো কা পানি
ম্যয় সম্‌ঝেঁ য়োঁ হ্যায় মোতি কী লড়িয়াঁ...'

তোর আঁসু-ভরা চোখ তুই আমাকে দেখাস্ না ফুল্‌কি। ঐ ছ্যাখ্, আমাদের ট্রেন চলে এলো।

বাজাওয়ালা আনোখী আর গীত-পাগল ফুল্‌কি মুখোমুখী দাঁড়ায়। ফুল্‌কি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আনোখীকে জড়িয়ে ধ'রে বলে,

—আমার মন বাঁধা আছে আনোখী, আমি আগে বুঝিনি,—আমি যাবো না।

পাঁচ আঙুলে হারমোনিয়ামের গলা টিপে সুর থামিয়ে দেয় আনোখী। ট্রেনের তীব্র হুইশিলের সঙ্গে সে যেন তারই আর্তনাদ শোনে। ক্ষণিকের জন্যে ভাবে, নির্মম একটানে ছিঁড়ে নিয়ে গেলে কেমন হয় ফুল্‌কিকে! পরক্ষণেই মনে হয় কিস্‌সাওয়ালার, কিস্‌সার তাতে অপমান হবে। বাজাওয়ালার বাজায় আর গান জমবে না।

...আনোখী!

কথার জবাব না করে ট্রেনে লাফিয়ে ওঠে আনোখী। ট্রেনের কামরার কাঠে কৌশলে পা বাধিয়ে ঝুঁকে পড়ে সামনে। পাঁচ আঙুলে হারমোনিয়ামে সুর তুলে বলে,—ভালোই হলো।

—আনোখী!

—তুই জানিস্‌না, এ খুব ভালো কিস্‌সা হলো। তোর কাছে সেলাম কিস্‌সাওয়ালী, তুইও আনোখীকে শেখালি।

—তুই চলে যাচ্ছিস্, তোর জন্যেও মনটা আমার দুখাচ্ছে আনোখী, তুই বিশ্বাস কর্।

—অবিশ্বাস তো করিনি।

আনোখী হাসতে-হাসতেই গাড়ী চড়ে। হাত নাড়ে আনোখী। আনোখীর হাসিটার ওপর অনেক রঙের আলো ঝল্‌কায় প্ল্যাটফর্মের কাচের শো-কেস্ থেকে, আর ফুল্‌কির বুকটা দরদে নিঙড়ে যায়। চোখ মুছে বেরিয়ে আসে ফুল্‌কি।

ঘরে এসে ফুল্‌কি আজ কেন এমন পাগল হলো বোঝে না গোপাল। গোপালকে ফুল্‌কি বলে,

—তুই আমায় ধরে রাখ্‌। কেন ছেড়ে-ছেড়ে দিস্‌ আমায়?

—ছেড়ে দিলাম কোথায়? তুই তো রঙ্গিলী নাজ্‌নী সেজে মেলা দেখতে গেলি।

মাথা চুলকোয় গোপাল। ফুল্‌কি জ্বলে ওঠে,

—তাই বলে তুই আমায় ছেড়ে-ছেড়ে দিবি? যা চাইবো তাই করতে দিবি? কেন? তোকে অত ভালো হতে কে বলেছে?

রাগ করতে-করতেই অঝোরে কাঁদে ফুল্‌কি! গোপাল ছাখে তার ভালবাসার ফুল্‌কি ঝড়ে-ঝাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাছে টেনে নেয় গোপাল। গায়ে মাথায় হাত সাপ্‌টে দেয়। বলে,—তুই কাঁদলি কেন ফুল্‌কি?

—বেশ করেছি।

গোপাল বলে,—তুই কিস্‌সা ভালবাসিস্‌, গীত ভালবাসিস্‌—তোর ঘুরতে-ফিরতে ইচ্ছে করে···

—না! তুই কিছু বুঝিস্‌ না।

দুজনে চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে ফুল্‌কি বলে,—আমার এই ঘরখানারও একটা কিস্‌সা আছে।

—কে বললো?

—আমি বলবো তোকে। আমি কিস্‌সাওয়ালী···

—পরে বলিস্‌।

গোপালের বুকে মিলিয়ে ফুল্‌কি চুপ করে থাকে আর তাদের দুজনকে দেখতে তারার নক্সা-কাটা আঁধার লুটিয়ে আকাশখানা নামতে থাকে সেই ঘরের ভেতরে। আজকের রাতটায় অনেক গীত আর অনেক কিস্‌সার স্বাদ পায় ফুল্‌কি।

আশু ডাক্তারের বাড়ি

সে এক শ্রাবণের দিন ছিলো। বেলা তিনটের সময় যখন খবর এলো, সমস্ত শহরে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো কথাটা। সমস্ত শহর বলতে সমস্ত শহরেই—অর্থাৎ প্রতিটি বাড়িতে—প্রতিটি মানুষের কাছে। শোনা গেল আশু ডাক্তার আসছেন। দোকানে বাজারে কথা হতে শুরু করলো। ইস্কুলে খবর যেতে হেডমাস্টার মশাই চশমাটা খুলে তাকালেন সংবাদদাতার দিকে। ছেলেটি সাইকেল চেপে দাঁড়িয়েছিলো। চশমাটা আবার পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলো বুড়ো দারোয়ান। দুই চোখ এমন ঝাপসা হয়েছিলো তার, অতবড় পেতলের ঘণ্টাটাও সে দেখতে পাচ্ছিল না। সাইকেল নিয়ে অমন আরো কয়জন ছেলে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছিল কলেজে, হাঁসপাতালে—মেয়েদের স্কুলে।

সব বন্ধ হয়ে গেল। বেরিয়ে এলো মানুষ পথের ওপর। সকলেই চললো পারঘাটের দিকে। সরকারী অফিসগুলোয় ছুটি হলো না বটে—তবে সেখানে আর কোন মানুষ রইলো না। যাঁরা ইন্‌চার্জ—তাঁরা রইলেন। অর্থাৎ থাকতে বাধ্য হলেন। দেখা গেল কাছাকাছি গ্রাম থেকেও মানুষ আসছে। সকলে চলেছে।

পারঘাটে দাঁড়িয়ে সকলে চেয়ে রইলেন নদীর দিকে। ছোট এ শহরটায় বেশী মানুষ ছিল না। যতগুলো চালা, কুঁড়েঘর—সব ঘর থেকেই এসেছে মানুষ।

আশু ডাক্তার তখন মাঝনদীতে। ফ্ল্যাটের ওপর তাঁর খাট। ফ্ল্যাট আসছে ধীরে ধীরে। আশুবাবুর চোখেমুখে পড়েছে সূর্যের রাঙা আলো। পায়ের কাছে আজীবনের সঙ্গী শোভারাম ঠিকই বসে আছে। চোখে না দেখেও বলে দিতে পারে এ শহরের মানুষ,

শোভারামের হাতে ধরা আছে আশুবাবুর চশমা, সেই আছিকেলে ব্যাগটা, রুপোর নস্যির কৌটোটা।

ফুল এখানে কিনতে পাওয়া যায় না। বৈকুণ্ঠবিহারী—পুরনো উকিল—তিনি বললেন—গোলাপগুলো নিয়ে আসুক কেউ।

তিনি বলবার আগেই তাঁর গোলাপবাগান উজাড় করে দিয়েছে ছেলেরা। বৈকুণ্ঠবাবুর স্ত্রী বললেন—ছুঁচসুতো এনে দে। মালা গেঁথে দিই একটা।

আশুবাবুর জন্যে মালা গাঁথতে গিয়ে তাঁর চোখটা বারবার বেইমানী করতে লাগলো। কতবার কত অসুখে আশুডাক্তার তাঁকে বাঁচিয়েছেন সেই সব কথা মনটাকে নিংড়ে চোখ দিয়ে জল হয়ে ঝরছে। ফুলগুলো চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আরো বড় দেখাচ্ছে—ছুঁচ যেন চলতে চায় না।

তবু গাঁথা হলো মালা। তারপর আশু ডাক্তার পৌঁছলেন। পরলেন সে মালা। একজন বললো—আশু ডাক্তারের বাড়িতে দোলনচাঁপা ফুটেছে না?

সে দোলনচাঁপা নিতে যে ছেলেটি এলো, তাকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মাখনবাবু। বললেন—কে পাঠালো তোমাকে?

—ডাক্তারবাবুর জন্যে ফুল নিয়ে যাব।

—এখানে কেন?

তাকে একরকম বের করে দিলেন মাখনবাবু। হাতে লাঠির মুঠ-টা শক্ত করে ধরে চেয়ে রইলেন। মানুষগুলো সবাই পাগল হয়ে গেল? তাঁর বাড়িতেও কেউ নেই? মালী চাকরগুলো—সবাই চলে গিয়েছে ঐ পারঘাটে? ঐ তো কাশীবাবুও যাচ্ছেন। ছাখ কাণ্ড, হাঁটতে পারেন না—উঠছেন সাইকেল রিক্সায়।

কাশীবাবুকে মাখনবাবু নমস্কার করলেন। তবে কাশীবাবু দেখতে পেলেন কিনা, বোঝা গেল না। সামনের দিকে চেয়ে, কেমন একরকম চোখে তিনি শুধু বললেন—তাড়াতাড়ি চালাস্ বাবা! দেখা না

হলে আশু রাগ করবে। হয়তো বলবে—কাশী, তুমি এলে না? কি এমন তোমার রাজকার্য ছিল?

সবাই চলে যায়। লক্ষ্য করতে ভোলেননি মাখনবাবু, যে কাশীবাবু, বা ফলওয়ালাটা, বা তাঁর বুড়ো কণ্ট্রাকটর—সকলেই জুতো খুলে রেখে গেল।

কি এমন হয়েছে? মাখনবাবুর যেন কেমন লাগে। লাঠিখানা ধরে দাঁড়িয়েই থাকেন। পথ দিয়ে যত জন যাচ্ছে, সকলেই এদিকে একবার তাকিয়ে যায়। বলে—আশু ডাক্তারের বাড়ি।

পারঘাটে বোধ হয় কি না কি কাণ্ড চলেছে এতক্ষণে। মাখনবাবু একলা দাঁড়িয়ে থাকেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁর টাইপিস্ট ভদ্রলোক।

বলে যান—গেলে পারতেন মাখনবাবু!

মাখনবাবু দেখেন, তাঁর প্রৌঢ় সাবকণ্ট্রাক্টর গৌরবাবু একলা রইলেন। মাথাটা তুই হাতে ধরে—একলা বসে রইলেন চেয়ারে।

কিন্তু এ হলো আশু ডাক্তারের শেষযাত্রার কথা। প্রথমেই শেষের কথা বলে যে শুরু করে সে আর যা-ই হোক, চতুর লিপিকার নয়। গল্প তো এখানে নয়। আর গল্পই বা কোথায়? আশুবাবুর মতো মানুষকে নিয়ে গল্প হয়? গল্প হয় না। এসব লোক সৃষ্টির ব্যতিক্রম। এসব মানুষ আর বেশী হয় না, এই যা সুবিধা। এইসব মানুষই যদি বেশী হতো, তাহলে মাখনবাবুরা যেতেন কোথায়? এখন তো মাখনবাবুদেরই প্রয়োজন। আশুবাবুরা তো বাতিল হয়ে গিয়েছেন। বাতিল একটা মানুষকে নিয়ে এত সমারোহ করে কেউ? আসলে এই শহরটাই পাগল। এখানকার মানুষগুলোর হদিশ বাইরের লোক পায় না। যেমন মাখনবাবু পাচ্ছেন না। কেমন করে পাবেন?

আশু ডাক্তারের কাহিনীর চেয়ে তাঁর বাড়িখানার গল্প আরও বাস্তব।

এই শহরটায় যদি পৌঁছতে হয়, তবে কাটোয়া লাইনে ট্রেন বদলে তারও পরে নামতে হবে স্টেশনে। রাঢ় দেশের সবে শুরু। মনে হবে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এখানে একটু কৌতুক করেছে। চারিপাশে নাবালজমি। একেবারে পরিচিত চেহারা। সেই ঝোপ-ঝাড় কচুবন—সেই সামান্য বর্ষাতেই জল দাঁড়ানো। এখানে সেই মাটিই হয়ে গেছে উঁচু। মাটি দেখলে বুঝতে ভুল হবে না, যে এ মাটিতে সোনা ফলে। অর্থাৎ এ হলো সেই মাটি, যা, 'আবাদ করলে ফলতো সোনা'। এখানে মাটিতে ঝোপজঙ্গল হতে চায় না। চোখে পড়ে উন্নত শালগাছ। চোখে পড়ে আদিবাসী ও অন্যান্য প্রদেশের মানুষের এক বিমিশ্র বসতি। রাজমহল থেকে সাঁওতালরা এসেছিলো পলু অফিসে রেশমকীটের চাষ করবার কাজে। উঠে গেল পলু অফিস। প্রখ্যাত রেশমশিল্প টিঁকে রইলো সরকারী লালফিতের দয়ার দিকে চেয়ে। তবে সাঁওতালরা রয়ে গেল।

অনেক মানুষকে মেলাবার মেশাবার জাদু জানে এ জায়গাটা। শহরটার বৈশিষ্ট তাই ফুরোয় না।

এই শহরের দক্ষিণদিকে আশু ডাক্তারের বাড়ি। সবচেয়ে ভালো পল্লীতে সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি। দোতলা এই কুঠিবাড়িটির ওপরে লালনীল কাঁচের একটা গম্বুজ ঘর অনেকদূর থেকেও চোখে পড়ে মানুষের। পথচলতি হাটুরেরা শুধোয়—কতদূর এলাম গ?

—আর দূর কোথায়? আশু ডাক্তারের বাড়ি দেখছ না ঐ দেখাচ্ছে?

লালনীল কাঁচে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করে। তাই দেখে বোঝে তারা।

আট বছর আগে আশু ডাক্তার যখন চলে গেলেন শহর ছেড়ে—দেখা গেল তাঁর পনেরো হাজার টাকা ধার হয়ে গিয়েছে। মাথা চুলকে গেলেন কাশীবাবুর কাছে। বললেন—তাইতো হে কাশী,

যাব বলে বড় আশা করেছিলাম। যাওয়া দেখছি হল না! ধার দেনা হয়ে রয়েছে কি রকম!

কাশীবাবু বললেন—দেখি কি করতে পারি।

সন্ধ্যেবেলা গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

বললেন—মিস্টার রায়, একটা অনুরোধ করতে এলাম।

—কি বলুন?

—আশু ডাক্তারের কথা।

—এসেছেন না কি তিনি?

শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন ম্যাজিস্ট্রেট। কাশীবাবু বললেন—না। আপনি বলছিলেন না, শ্যামলাল জৈন আপনার কাছে ঘোরাঘুরি করছে? বাস এজেন্সির জন্যে?

—হ্যাঁ। শ্যামলাল জৈনের তো অনেক বায়না। বাস, সিনেমা, সবই চায়।

—তো, আপনি বলুন তাকে আশুর বাড়িটা কিনে নিয়ে ঋণমুক্ত করুক তাকে।

—কি বললেন?

ছড়িটা মেঝেতে আস্তে আস্তে ঠুকতে লাগলেন কাশীবাবু। বললেন—আশুর ধার হয়েছে পনেরো হাজার টাকা প্রায়। ধার শোধ করতে যদি থাকে এখানে, তবে ধার বাড়বে ছাড়া কমবে না। আমি যদি কিনতে চাই—তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে। আমার কি কি খরচ খরচা আছে, তার ফর্দ আমাকে শোনাবে। আমি যদি শ্যামলালকে বলি, শ্যামলাল সে কথা তাকে বলবে—ও উড়িয়ে দেবে। এক আপনি বললে সব দিক থাকে।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আশ্চর্য লোক আপনাদের আশুবাবু। হদিশ করা যায় না। আমার ত' ধারণা ছিলো আশপাশের টাউন থেকেও লোক আসে যখন—ভদ্রলোক পয়সা করেছেন। দেখি, আমি কি করতে পারি।

—হ্যাঁ। আপনি বললে শ্যামলাল বাড়িটা কিনে আশুকে ঋণমুক্ত করতে পারে।

কাশীবাবু উঠে পড়েন। শেষ অবধি মাড়োয়ারীর হাতে যাবে আশু ডাক্তারের বাড়ি, সে তাঁর ভালো লাগে না। তবে অন্যদের থেকে শ্যামলাল ভালো। এ শহরেরই ছেলে।

শ্যামলাল ঋণমুক্ত করে আশুবাবুকে। আশু ডাক্তারের ক্ষ্যাপামি, গ্রামে গিয়ে থাকবেন। শহরের লোকেরা সেটা বেশ সস্নেহে প্রশ্রয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে। এমন কি শহরের তরফ থেকে তাঁকে একটা ফেয়ারওয়েল দেবার কথা বললে শহরের মাতালবাবু দুলাল মিত্র তারাচাঁদের মদের দোকানে বসে হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে—দূর, যত ক্ষ্যাপামি! ডাক্তার কি যাচ্ছে? আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, যে ফেয়ারওয়েল দেব?

তাই শোভারাম আর আশু ডাক্তার যেদিন সাইকেল রিক্সায় ওঠেন—দুলাল মিত্রই গাড়ি নিয়ে আসে। বলে—মেজাজ খারাপ করাবেন না সকাল বেলা। রিক্সা চড়ে যাচ্ছেন কোন্ আক্কেলে? সে জখম ঠ্যাঙটার কথা মনে নেই?

বিনা প্রতিবাদেই আশু ডাক্তার ওঠেন গাড়িতে। পথে যত জনের সঙ্গে দেখা হয়, দুলাল গাড়ি থামায়, বলে—ডাক্তারবাবু তাঁর সে গ্রামের জমি-তে বেড়াতে যাচ্ছেন! ক-দিনের জন্যে।

বৈকুণ্ঠবাবু বলেন—কি যে শত্রুতা করে যাচ্ছ আশু? সেই ছুট করাবে তো চার মাইল? ছুটতে হবে তো কথায় কথায়!

সকলেই একইভাবে কথা বলে। এই শহর থেকে আশুবাবু যে চার মাইল দূরে গ্রামে যাচ্ছেন একটানা চল্লিশ বছর এখানে থাকবার পর—সে যেন মস্ত একটা খেলার কথা! সে কথাটায় যেন গুরুত্ব আরোপ করবার কোন দরকার নেই।

শ্যামলাল জৈন কিন্তু হাতে স্বর্গ পায়। অনেকদিন ধরে এই

বাড়িটার ওপর লোভ তার। কবে তার পূর্বপুরুষ গামছা কাঁধে চানা চিবোতে চিবোতে এই শহরে এসেছিলেন—আর তার বাপ রতিলাল অনেক পয়সা করেও সেই কথা ভুলতে না পেরে শহরের বাজার জায়গায় বাড়ি করেছিলো, সে সব কথা ভাবতে চায় না শ্যামলাল। শ্যামলাল জানে, সে-ই এই শহরের মাথা। তার মতো টাকা কারো নেই। তার মতো প্রতিপত্তিও নেই কারো। এই বাড়িটা তারই যোগ্য। ঐ আশু ডাক্তারের নয়।

বাড়িটা কিনেই শ্যামলাল মিস্ত্রী লাগায়। এ বাড়িটা পাঁচ বিঘে জমির ওপর। সামনের দিকে দেবদারু, ইউক্যালিপ্‌টাস আর ঝাউগাছ সারি সারি। আউটহাউস ছাড়াও চালাঘর কতকগুলো জমিতে। দেখে দেখে শ্যামলাল আশু ডাক্তারের অবিমৃষ্যকারিতায় অবাক হয়। কাশীবাবু সকালে হাঁটতে বেরিয়েছেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢোকেন, বলেন—কি শ্যামলাল? বাগান দেখছো!

বাগানও একটা আছে! তাই না? শ্যামলাল দেখে এবার! ইস্! লোকটার গায়ের রক্ত-জল-করা কত টাকা ঐ বাগানে ঢেলেছিলো। গোলাপ, বেলা, চামেলীর ঝাড়—রজনীগন্ধা! এখন নতুন বর্ষা। দোলনচাঁপা ফুটেছে। ডালে ডালে জড়িয়ে কামিনী আর হাসনুহেনা হাসছে গন্ধ ছড়িয়ে।

সে বলে—না কাশীবাবু, প্ল্যান ভাবছি।

—কি প্ল্যান, শ্যামলাল?

শ্যামলাল জবাব না দিয়ে মুচকি হাসে। কি যে প্ল্যান ছিলো তার মনে, বোঝা যায় ক'দিন বাদে। জমিতে তরিতরকারী আবাদ করে, আউটহাউস আর চালাঘরে সে সব পরিবার বাস করছিলো, তারা নোটিশ পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তাদের ছাড়তে হবে এই জমি। তারা ধরে নেয় এ একটা ঠাট্টা হচ্ছে।

দিন সাতেক বাদে আবার হামলা আসে। ছেড়ে দিতে হবে

সব। মাঝি-মেঝেনরা বলে—আশুবাবু বসত করায়ে গেল। আশু ডাক্তারের বাড়ি যি গ। ছেড়ে যাবে কেনে ?

গোকুল রুইদাস বলে—সবে নতুন চারা দিয়েছি। কেমন তেজ করে উঠছে বেগুন লঙ্কার চারা—ছেড়ে যাব কি গ ? আশু ডাক্তারের বাড়ি থেকে, তুমি, শ্যামবাবু, উঠতে বলছো কেন ? বুঝতে লারছি মোরা।

আউটহাউসের ফলওয়ালা ইশাক্ বলে—গোল করো না বাবু সাত সকালে। আশুবাবুকে দেখাতে যাচ্ছি নাতনীটা। যাও না, ঘরে যেয়ে কামকাজ কর না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ বয়ে ভাবে, বাড়িটা ত আর আশু ডাক্তারের নয়। এটা যে এখন তার। বুঝতে পারছে না কেন কেউ ?

শ্যামলাল তখন সত্যিই পুলিস আনে। হামলা করে তুলে দিতে চায় সব। কাশীবাবুকে বলে—এরা বুঝতে পারছে না যে বাড়িটা হাতবদল হয়েছে। বুঝলেন সার ?

—বোঝা যে মুসকিল শ্যামলাল ! তা এদের সময় দাও না কেন ? এরা দেখেশুনে উঠে যাক।

—আপনি যেমন ! বাস এসে পড়ছে আমার। গ্যারেজ বানাতে হবে না ?

শেষ অবধি বিনেভাড়ার বাসিন্দেরা উঠে যেতে বাধ্য হয়। আশু ডাক্তারের ফুলবাগান একদিকে বাঁচিয়ে বড় বড় গাছ দুটো কাটিয়ে ফেলে শ্যামলাল। বাড়ির আব্রুর জন্যে জানলায় কাঁচ বসায়। ঘরের মেঝে খুঁড়ে মোজেইক করে। বাড়িটার রঙ হয় লাল-নীল-সবুজের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। সবশেষে বাড়ির সামনে লিখে দেয় 'শ্যাম-নিবাস'।

ধুমধাম করে গৃহপ্রবেশ হয়। তার মা বলেন—ফুলবাগানটা রেখে দে বাবা। মুরলী-মনোহর পূজায় লাগবে।

আশু ডাক্তারের বাড়িটা এমন করে ক্ষতবিক্ষত করে অপারেশন করে বদলে ফেলে শ্যামলাল—কিন্তু তারপরে সে ধাক্কা খায় একটা।

কেউ তাকে বলেনা 'শ্যামলালের বাড়ি'। সবাই বলে 'আশু ডাক্তারের বাড়ি'। নতুন পিওন এসে বলে—এটাই তো আশু ডাক্তারের বাড়ি? তার নামে চিঠি আসে—শ্যামলাল জৈন, কেয়ার অফ আশু ডাক্তারের বাড়ি। তারই বাসের ড্রাইভাররা বলে—আশু ডাক্তারের বাড়ি যাচ্ছি।

শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যায় শ্যামলাল। প্রথমটা হাসির ছলে নিলেও শেষে তার ভালো লাগে না। সে অযথা ধমকে ওঠে—কে বলেছে আশু ডাক্তারের বাড়ি? এ বাড়ি এখন আমার।

মুচকি হেসে চলে যায় লোক। ইশাক ফলওয়ালা একদিন শুনিয়ে যায়—যতই পয়সা করুক না কেন শ্যামলালবাবু—বাড়ি আশু ডাক্তারের। আর কেউ এ বাড়ির মালিক হতে পারবে না কোন দিনও। ইশাকের সাফ কথা।

অন্য সকলের কথা যাক—ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডিনার খাওয়ায় শ্যামলাল। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন—আশুবাবুর বাড়িটা এমন করে বদলে ফেললেন কেন? সেই গাছ দুটো কেটেছেন? দাম বুঝলেন না শ্যামলালবাবু? ও যে কাশ্মীরি ঝাউ। আর চেনার গাছ ছিলো যে। ইস্—আশুবাবুর বড় সখের গাছ। এবার শহরে এলে পরে বৈকুণ্ঠবাবুকে বলবো মাঝপথে ধরে যেন বুড়োকে শহরের দিকে রেখে দেন, নিজের বাড়িতে। তাঁর বাড়িটা আর বাগানটা এমন তছনছ হয়েছে দেখলে মনে ঘা লাগবে।

অনেক কষ্টে ও অর্থব্যয়ে আহারের আয়োজন করেছিলো শ্যামলাল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা শুনে সব বিস্বাদ হয়ে যায় মুখে।

তারই পরে গ্যারেজে আগুন লাগে শ্যামলালের। পেট্রোল থেকে এই কাণ্ড হয়। পাঁচ সাত হাজার টাকা লোকসান হয়ে যায়। শ্যামলাল বলে—এ বাড়ি বেচে দেব আমি। হতভাগা বাড়ি। কিনলো যে, পয়সা খরচ করে মেরামত করলো যে—বাড়িটা তার নয়? বাড়ি আশু ডাক্তারের? চাই না এ বাড়ি।

শ্যামলালের পরে এ বাড়ি ত্থম করে কিনে বসেন সরকারী কণ্ট্রাক্টর অঘোরবাবু। অঘোরবাবুর ছেলে বরেন এসে বসে এখানে। বলে—শ্যামলালের কি রুচি! যা তা করেছে বাড়িটাকে।

বাড়িটার এবার ঘরে ঘরে পার্টিশন ওঠে। শহরের পাঁচমাইল দূরে গড়ে উঠেছে সরকারী এক পরিকল্পনা। এখন চলেছে বাঁধের কাজ। বলা যায় না, ভবিষ্যতে বাঁধের সে জল থেকে হয়তো বিদ্যুৎ সৃজন করাও সম্ভব হবে। এখন সে পরিকল্পনার কাজে সরকারী হাইওয়ে দিয়ে দিবারাত্রি বাস, ট্রাক আর জিপ বোঝাই মানুষ চলেছে। সরকারী অফিসার, মন্ত্রী বা টুরিস্ট—সকলকে সেই কেষ্টনগরে গিয়ে খেতে হয়। একটা ভদ্র স্থান নেই ধারে কাছে।

বরেন একটা হোটেল খোলে।

শ্যামলাল গাছগুলোর আর বাকি রাখেনি কিছু। যা আছে, তারই নিচে বরেন বেতের চেয়ার পেতে বসবার বন্দোবস্ত করে। এখানে বসে, ঝাউয়ের মর্মর শব্দ শুনতে শুনতে, ইউক্যালিপটাসের মিষ্টি গন্ধে বুক ভরিয়ে নিয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি ভুলতে পারবেন অতিথি-রা। ঘরগুলোতে হবে আহার আর বাসের সুবন্দোবস্ত। মদের লাইসেন্সও পায় যেদিন, সেদিন না বলে পারে না তারানাথ—শেষ অবধি ডাক্তারবাবুর বাড়িটায় মদ চালাবেন বরেনবাবু?

—আমার বাড়িতে বলুন!

—আশুবাবু কিন্তু একেবারে পছন্দ করতেন না। মাতলামি করবার জন্যে দুলালবাবুকে ছড়ি দিয়ে মেরেছেন কতবার।

বরেন সে সব কথা শোনে না। তার কানে যায় না কোন কথা। বাড়ির সামনে থেকে 'শ্যাম নিবাসে'র ট্যাবলেট সরিয়ে ফেলে সে বসায় 'হ্যাপি নুক'। হ্যাপি নুক-এর বাড়িতে বসে, নতুন, টাটকা টাকার ঝাঁঝে বরেন নতুন নতুন ভাঙচুরের স্বপ্ন দেখে। সকালে মুখে পাইপ দিয়ে ঘোরে। জমিটায় গ্যারেজ ছিলো। পুড়ে গিয়ে কি কুৎসিতই না হয়েছে। সিমেন্টের গুদাম ইচ্ছে করলে এখানেই করা যায়।

জনপ্রিয় হওয়াই এ যুগে সার্থকতার মূলমন্ত্র। বরেন জনপ্রিয় হতে চেষ্টা করে। ডেকে ডেকে ছেলেদের লেমনেড খাওয়ায়। পাড়ার মাননীয় লোকদের বলে—সন্ধ্যাবেলা এই গরীবখানায় বসে একটু চা খেলে নিজেকে ধন্য মানবো সার।

এত করে ও কারো মন পায় না বরেন।

শহরটা যেন কোন সুদূর অতীত দিনের নেশায় ঝিমোচ্ছে। নতুন কিছু তারা নিতে পারে না যেন। বরেনের এই চলতাপুরজা ভাব এদের মনে কোন দাগই কাটে না। এদের মনোজগতে বরেন যেন ছাড়পত্র পায় না।

গ্রামোফোনে ফিলমের রেকর্ড বাজিয়ে বরেন হ্যাপি নুককে প্রাণবন্ত করতে চায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গায়ে পড়ে আলাপ করে মিশতে চেষ্টা করে এক সঙ্গে।

কিন্তু কি যে আছে এই শহরটা আর তার মানুষগুলোর মধ্যে। বরেনের শতচেষ্টাতেও মনের দরজা তারা যেন খুলতে চায় না। শহরের মাতাল ব্যবসায়ী দুলাল, যার টাকাতে তারাচাঁদের মদের দোকান চলছে—সে-ও কখনো এসে হ্যাপি নুক-এ বসে না। বরেনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আশুবাবুর বাড়ি বসে মদ খাব? মাথা খারাপ হয়নি তো!

অন্যদিক দিক দিয়ে চেষ্টা করে বরেন। হাঁসপাতালে চট করে পিতামহীর নামে একশো টাকা দিয়ে বসে। ছেলেদের স্কুল নতুন বাড়ি করছে—সেখানে দেয় টাকা।

আশু ডাক্তারের বাড়িটা বোধহয় মজা দেখে। ক-দিন বাদে, স্টেশন থেকে অতিথিদের হ্যাপি নুক-এ আনতে যায় সে। অতিথিরা সরকারী লোক। তাঁরা হ্যাপি নুক-এ রাত্তিরটা কাটিয়ে ভোরবেলা যাবেন প্রোজেক্ট-এ। সেখান থেকে ফিরবেন দুপুরে। সাইকেল চালিয়ে এসে পড়েন তার বাবার সাবকন্ট্রাক্টর গৌরবাবু। বলেন—এই যে ইনিই বরেনবাবু। আশুবাবুর বাড়িতে হোটেল খুলেছেন একটা।

—আশুবাবুর বাড়িতে হোটেল।

যেন ভাবতে পারেন না প্রবীণ সরকারী কর্মচারিটি সে কথা। বলেন—তার কি দরকার ছিল মশাই? তিরিশ বছর আগে আমি ছিলাম এখানে সার্কেল অফিসার। তখন ত' আশুবাবুর বাড়িতেই আমরা থেকেছি, খেয়েছি কতদিন! আশুবাবু তো দোর বন্ধ করতে জানতো না!

বরেন বলে—আমি ঐ বাড়িটা কিনেছি কি না!

—ও! আশুবাবু?

—তিনি রিটায়ার করে কোথায় যেন গেছেন?

—কাছাকাছি, একটা গ্রামে। বলেন গৌরবাবু।

সরকারী কর্মচারীটি হ্যাপি নুক-এ এসে দেখেশুনে যেন দুঃখিত হন। বলেন—আশুবাবুর বাগানের কিছুই রাখেননি? ঐ ঝাউগুলো আমি এনে দিয়েছিলাম ওঁকে, জানেন? মোটে দুটো রয়েছে?

বরেন হেসে বলে—গাছ এনে দিয়েছিলেন? বনমহোৎসব টাইপের ব্যাপার বোধহয়?

বরেনের স্মার্ট কথাবার্তা ভদ্রলোকের মনে দাগ কাটে না। বলেন—ও সব মহোৎসবের ফাজলামি এখন হয়েছে। আশুবাবু একা এ শহরে কম করে তিনশো গাছ লাগিয়েছেন, জানেন? আশ্চর্য বাতিক ছিল। আমাকে বলতেন, যে জায়গাটায় থাকব তাকে সুন্দর করে তুলব গাছ লাগিয়ে। বলতেন, এই রুক্ষ দেশ, পথ চলতে যদি মানুষরা ছায়ায় বসে দু'দণ্ড জুড়োতে পারে, তাতে-ই আমার শ্রম সার্থক হবে। এমন মানুষ কি আর দেখব?

পরদিন যাবার সময়ে বলে যান—ইয়ংম্যান, হোটেল খুলছেন খুলুন। তা বলে ড্রিঙ্কস্ রাখবার দরকার কি?

বরেন বোঝে যে অন্যরা খুশিই হয়েছেন। নেহাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটি সঙ্গে ছিলেন, তাই কিছু বলতে পারেননি। সে ভাবে

স্থানীয় মানুষে দরকার নেই আমার। এই রকম অতিথি পেলেই চলে যাবে আমার হ্যাপি নুক।

কিন্তু কোথায় যেন গোলমাল হয়ে যায়। জায়গাটার টিমে তেতালা চাল দেখে তার বিরক্তি জাগে। আশু ডাক্তার যে কে, তা জানে না বরেন, কিন্তু তিনি জ্যান্ত থাকতেই যে প্রেত হয়ে চেপে আছেন তার হ্যাপি নুক-এর ওপর। হোটেলটা দাঁড়িয়ে-ও দাঁড়াতে চায় না। বিরক্ত হয় বরেন। মনে হয় ঐ অর্থব্যয় সবই জলে গেল।

গৌরবাবুকে বলে—আশু ডাক্তার কি করতেন? লোকে তাঁকে ভোলে না কেন? ভদ্রলোক খুব বড় ডাক্তার ছিলেন বুঝি?

গৌরবাবু বলেন—আশুবাবু? বড় ডাক্তার? তা হবেন। কি জানেন, একটা লোক সুখে দুঃখে দুইপুরুষ কাটিয়ে গেল আমাদের মধ্যে। কি যে করে গেল বলতে পারি না—তবে আশুবাবুর নাম মানুষের ভুলতে অনেক দেরি আছে।

—বেঁচে আছেন ত?

—নিশ্চয়। সেদিন গিয়েছিলাম না? দিব্যি আছেন। একটু হাওয়া বদলাচ্ছেন বই তো নয়—এলেন বলে। সকলেই তাঁকে বলে, এই তো আপনার সব কর্মচারীরাই তো বলে—ডাক্তারবাবু আপনার বাড়িটা কেবলই হাত বদলাচ্ছে। বাড়িটার চেহারা পালটে গেল। চলুন একবার।

—এখন ফিরে কিনতে গেলে, পারবেন কি তিনি?

—আশুবাবু চাইলে পরে, জানেন বরেনবাবু, এ শহরে তাঁর টাকার অভাব হবে না। সেটি জানবেন।

বরেনের মনেও সেই আশাভঙ্গের দুঃখটা হয়। যেটা শ্যামলালের হয়েছিলো। সে ভাবে পয়সা দিয়ে কিনে তবু কেন মালিক হতে পারছি না?

এমনি সময় বরেনের সঙ্গে কৌতুক করে তার নিয়তি। কেষ্টনগর থেকে হাইওয়ের নতুন শাখা চলে আসে সোজা প্রোজেক্ট-এ।

এ শহরটাকে বাদ দিয়ে চলে যায়। এখানে. বাইরের মানুষের আনাগোনা কমে আসে। প্রোজেক্ট্-এর জায়গায় লাইসেন্স নিয়ে হোটেল জাঁকিয়ে বসে পাঞ্জাবী মালিক।

হ্যাপি নুক-এ আর সুখ খুঁজে পায় না বরেন। খুঁজতে থাকে খদ্দের।

মাখনবাবু এই সুযোগে প্রবেশ করেন রঙ্গমঞ্চে। হালআমলের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সংগ্রামী—বীর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট-এর ভূমিকা নিয়ে। বরাবর বাংলার বাইরে ছিলেন। টাকা ফেলব, কাজ করবো—কাজ আদায় করবো—এই তাঁর নীতি। বাজে কথা, সেন্টিমেণ্ট বা হৃদয়-বৃত্তির অন্য কোন ঝামেলায় বিশ্বাসী নন মাখনবাবু।

কাছাকাছি জায়গায় ছুটো ধানকল খরিদ করায় তাঁর এ শহরে উপস্থিতি প্রয়োজন হয়েছে। বাড়িটা কিনে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলালের সঙ্গে ভাগ করে সিনেমা আর ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই-য়ে অংশীদার হয়ে বসেন। কলকাতা থেকে এত কাছে, পশ্চিমবঙ্গের এ শহর বাড়বেই, সমৃদ্ধ হবেই এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখেন তিনি। 'হ্যাপি নুক'-এর ট্যাবলেট উঠিয়ে ফেলে—গেটের উপর বড় করে 'আনন্দময়ী ইণ্ডাস্ট্রিজ'-এর ফলক টাঙিয়ে দেন মাখনবাবু।

শ্যামলালের সঙ্গে হাতে হাতে মিতালি। মাখনবাবুর নতুন বাস সার্ভিস চলে যায় বাংলা বেহারের সীমান্ত ছুঁয়ে। পাড়াটার শান্তি চলে যায়। লরি, ট্রাক, গাড়ি এসে ঢোকে কম্পাউণ্ডে। পেট্রোল পাম্পের সঙ্গে সঙ্গে মাখনবাবুর মোটর সার্ভিস—দিনেরাতে কাজ হয়।

টাকার যুগ। টাকার ভূমিকাই এখন সবচেয়ে প্রোগ্রেসিভ। শুধু অর্থে মন ভরে না। মাখনবাবু চান নেতা হতে। ইচ্ছে যায় দল বানাতে—সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

কাশীবাবুর কাছে পাড়েন কথাটা মাখনবাবু। কাশীবাবু কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন—তার মানে ইলেকশানে দাঁড়াতে চান?

—অনিচ্ছা নেই।

কাশীবাবু বলেন—মিথ্যে টাকাগুলো নষ্ট করবেন। আমরা আশু ডাক্তারকে ভোট দেব। আশু ডাক্তার মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশানে বছর বছর জিতছে। তার বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ায় না। আমি আপনাকে বারণ করবো মাখনবাবু।

—ভদ্রলোক ত' এখানে থাকেন না অবধি!

—ওর নাম থাকলেই যথেষ্ট। আপনি জানেন না মাখনবাবু, এ শহরটার প্রাণ ঐ মানুষটা,—বুঝতে পারেন না? আপনারা তিনজন এলেন—লোকে কি আপনাদের মালিক বলে স্বীকার করলো? এর থেকে-ও বুঝতে পারেন না?

আজ সন্ধ্যাবেলায় একা একা বাগানে দাঁড়িয়ে মাখনবাবুর সে-সব কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর ব্যর্থতার ইতিহাস। তিনিই জিতলেন মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানে। সে-ও বলতে গেলে আশু-বাবুরই দয়ার দান। কেন না আশুবাবু এবার নিজের নাম তুলতে দেননি। বলেছেন—পাগল হয়েছো? মাখনবাবু কতবড় মানুষ একটা—কত মানুষকে ভাত-কাপড় জোগাচ্ছেন—বাঙালীর মধ্যে একটা কর্মীলোক! এই সব মানুষকেই টেনে আন তোমরা।

মাখনবাবু ঠিক করেছিলেন আর কিছুতে না পারুন—মহানুভবতা করে জিতবেন শেষ অবধি। রাস্তা বাঁধিয়ে দিলেন—টাকা দিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের রিলিফ ফাণ্ডে।

কিন্তু আশুবাবু আবার তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন। আজকে তাই মনে হচ্ছে। আশুবাবুকে দেখতে আজ সহরের মানুষ জমা হয়েছে নদীর ঘাটে। মাখনবাবুর মনে হচ্ছে, এ সহরের মানুষ বেইমান। তাঁর টাকাকড়ি নিয়ে তারা লাভবান হয়েছে। কিন্তু হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢেলে দিয়েছে ঐ মানুষটার পায়ে। মাখনবাবু আজ পরাজিত।

গৌরবাবু এখনো বসে। মাখনবাবু বলেন—কই, আপনি গেলেন না?

—না। প্রাণটা তাঁরই দেওয়া। এ চোখে আর তাঁর মরামুখটা দেখব না।

প্রৌঢ় মানুষ গৌরবাবুর চোখের জল আজ নিঃসঙ্কোচে গড়ায়। বলেন—মাখনবাবু, আপনি বুঝবেন কি? একসময়ে কলকাতায় বড় ডাক্তার ছিলেন আশুবাবু। নিজের ওষুধের দোকান ছিল।

এক আশ্চর্য কথা যেন শোনেন মাখনবাবু—কি করে কোথা দিয়ে সর্বদা জিতে চলতো মানুষটা, বুঝতে চেষ্টা করেন।

সেই সময়, ইঞ্জেকশান-এ যখন সোনা ব্যবহার হতো, সেই সময় —গোল্ড ইঞ্জেকশান প্রভৃত জাল করেন এই আশুবাবু। বাজার ভর্তি করে ছাড়েন তাঁর ইঞ্জেকশান।

ভাগ্যচক্রে তাঁরই স্ত্রীর হলো টি. বি। ইঞ্জেকশান যা-ই আসে—ফেলে দেন আশুবাবু। চিনতে বাকি থাকে না, যে সবই তাঁর গোপন লেবরেটরির ছাপমারা। এক ফাইল খাঁটি ইঞ্জেকশানের জন্যে আশুবাবু সেদিন নিজের সব কিছু দিতে প্রস্তুত। কিন্তু মিললো না। হারালেন তাঁর স্ত্রীকে।

তারপর এই শহরে এসে বসলেন তাঁর টাকা পয়সা নিয়ে। বড় ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তার। সেদিনের জার্মানী ফেরৎ। এই শহরে এসে এই বাড়ি কেনেন আশু ডাক্তার।

তারপর, নিজের জীবনের তিনটে বছরের প্রায়শ্চিত্ত করতে ঢেলে দেন বাকি জীবনটা।

গৌরবাবু বলে চলেন—হাটে হাটুরেদের কষ্ট হতো, পাকা ঘর করে দিলেন—টিউবওয়েল করিয়ে দিলেন। রুগী দেখতে যেতেন, টাকা রেখে আসতেন টেবিলে। বলতেন—পথ্য দিতে পারবি না, ওষুধ দিয়ে কি করবো? কঠিন রুগী নিজের বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাতেন। বাড়িটার ঘর বাড়ালেন সেজন্যেই। হাসপাতালটা

গর্ভনমেণ্টকে ধরে করে বড় করলেন। নিজেই কিনে দিলেন এক্স-রে মেশিন। পথের পাশে গাছগুলো অবধি তাঁর হাতে বোনা। জানেন তো, রাঢ় দেশ—কুষ্ঠ রোগটা বেশি হয় এখানে। হাঁসপাতালে কুষ্ঠ-র আলাদা ওয়ার্ড, সে-ও তাঁর চেষ্টাতেই। কি দিনে, কি রাতে—আশু ডাক্তার জলেঝড়ে যাচ্ছেন দশমাইল দুরে রুগী দেখতে। স্কুলের বাড়ি, সে ওঁরই টাকাতে। এই শহরে একটা মানুষ নেই, যে ওঁর কাছে ঋণী নয়। টাকা উনি কম পেতেন না—হাঁসপাতাল থেকে মাইনে পেতেন—শহরের বড় লোকরা ওঁকে মাসে মাসে টাকা দিয়ে যেতো। কিন্তু সব উপার্জন-ই যার পরের জন্যে, তার কি টাকার অভাব ঘোচে? সঙ্গে এসেছিল ঐ শোভারাম। ওঁর অনেকদিনের সঙ্গী। জীবনে সুখ করতে দেখলাম না। ওঁর কথা মনে হতেই মনে পড়ে লণ্ঠন হাতে শোভারাম সঙ্গে রয়েছে—তিন ঠেঙো বেতো ঘোড়ার গাড়ি চড়ে চলেছেন সর্বত্র। ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার থেকে ঐ সাঁওতালরা, সবাই ওঁকে আপন বলে জানতো। ঐ রকম মানুষ না হলে, একলালোক—শেষে অত টাকা ধার হয়? ঐ যে গ্রামে গেলেন—ওঁর জায়গাটা ভাল লাগতো বলে—শ্যামলালের বাপ রতিলালই দিয়েছিলো ওঁকে জায়গাটা। তবে কপালে ছিলো এখানকার মাটি। তাই…তা শুনেছি খুব ধুম করে নিয়ে গিয়েছে ওরা…

—যাবেন নাকি গৌরবাবু?

—আপনি যাবেন?

গৌরবাবু যেন মাখনবাবুর মনটা বুঝতে পারেন। বোঝেন যে লজ্জা করছে মাখনবাবুর। যে মানুষটাকে কোনদিন-ই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন নি—আজ তার কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে, সকলের সঙ্গে এক হয়ে শ্রদ্ধা জানাতে বাধছে অহমিকায়। এই অহঙ্কারী মানুষটির জন্যে কষ্ট হয় গৌরবাবুর। তিনি বোঝেন, যে ভেতরের অহঙ্কার, মানুষটাকে সহজ হতে দিচ্ছে না।

গৌরবাবু বললেন—যান মাখনবাবু, কাজের মানুষ আপনি, কাজ

করবেন। ওঁর মুখখানা দেখলেও পুণ্য একটা। জানলেন? চলে
যান! আমি আপনার বাপের বয়সী। লজ্জা কি আপনার?

মাখনবাবু রিক্সা ডাকেন একটা। কি মনে করে জুতোটা খুলে
রাখেন। বলেন—গঙ্গার ঘাটে চল! বখ্‌শিশ পাবি!

যেতে যেতে মনে হয় এতজন গিয়েছে, তিনিও যাচ্ছেন, তাতে
আর লজ্জা কি? সঙ্কোচের কি আছে?

কিন্তু খানিকটা গিয়েই তিনি সোজা হয়ে বসেন। নিজের মনটাকে
দেখতে পেয়েছেন তিনি। রিক্সাকে বলেন—থামো। ফিরিয়ে নাও।

মাখনবাবু নিজেকে এমন করে আর কোনদিনও দেখেন নি।
কি হবে শ্মশানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে? তিনি কোনদিনও আশু
ডাক্তার হতে পারবেন না। অমন করে বুড়ো চাকরের হাতে ব্যাগ
দিয়ে জলঝড় ভেঙে মানুষের মনে পৌঁছতে পারবেন না।

না পারলে বোধহয় এখানেও টেঁকা যাবে না। কোন মানে-ই
হবে না। তিনি তিনি-ই—আর আশু ডাক্তার অন্য মানুষ।

ক্ষণিকের জন্যে বোধহয় দু'জনকে সমান সমান ভেবেছিলেন–
তাই দেখতে যাচ্ছিলেন শ্মশানে।

ভালই হলো। সে যেন বড়ই নির্লজ্জের কাজ হতো। নিজের
কাছেই নিজের ইজ্জত থাকত না। নিজের পরাজয় মাখনবাবু এমন
করে এর আগে অনুভব করেননি। মনেহয় এই পরাজয়ের লজ্জা
নিয়ে—চুপি চুপি ফিরে যাওয়া-ই ভাল।

রিক্সাওয়ালা বলে—কোথায় বাবু? কোথায় যাব?

ক্লান্ত শরীরটা ঢেলে দেন মাখনবাবু। বলতে চাননি, তবু তাঁর
সকল অহঙ্কার নিংড়ে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে জবাব, তাঁরই মুখ
থেকে

—আশু ডাক্তারের বাড়ি।